সাহিত্যমেলা

বাংলা । অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

<u>প্রস্তাবনা</u>

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

<u>PREAMBLE</u>

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

অষ্টম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই ‘সাহিত্যমেলা’ প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে ‘সাহিত্যমেলা’ বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ – এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ‘সাহিত্যমেলা’ বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা জোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

‘সাহিত্যমেলা’ বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের 'বাংলা' বইয়ের নাম 'সাহিত্যমেলা'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতি শ্রেণির নতুন বইয়েরই একটি নির্দিষ্ট 'ভাবমূল' (theme) আছে। অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাবমূল হলো 'বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি'। নয়টি পর্বে বিন্যস্ত এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকের রচনা এবং ভারতীয় সাহিত্য, অর্থাৎ এদেশের অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। বন্ধুত্ব ও সমানুভূতির নানান অভিমুখ আর তার বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়েছে লেখাগুলির মাধ্যমে। প্রতিটি পর্বে পাশাপাশি আছে একাধিক সমধর্মী বা সমবিষয়-কেন্দ্রিক রচনা। এই সজ্জার ধরনটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। 'হাতেকলমে' বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা-নির্ভর শিখনের সম্ভার। অষ্টম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একটি আলাদা দ্রুতপঠন পুস্তক হিসেবে সংযোজিত হলো প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের সম্পাদিত রূপ 'ছোটোদের পথের পাঁচালী'। সেই বইটিতেও রয়েছে কল্পনার রঙিন পরিসর। উপরন্তু, আমরা চেয়েছি উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী একটি গোটা বই পড়ার সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার দিকে যেন এগোতে পারে। এই দুটি পুস্তকই নতুন শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় রাজ্যের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

অষ্টম শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা' বইটিকে রঙে-রেখায় অপূর্ব সৌন্দর্যে অলংকৃত করে দিয়েছেন বেশ কয়েকজন বরেণ্য শিল্পী। তাঁদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির শেষে 'শিখন পরামর্শ' সংযোজিত হলো। আমাদের বিশ্বাস এই অংশটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেবে। আশা করি, বইগুলি রাজ্যের শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী হিসেবে গৃহীত হবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু
স্বাতী চক্রবর্তী অপূর্ব সাহা ইলোরা ঘোষ মির্জা

সহযোগিতা

মণিকণা মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

দেবব্রত ঘোষ

অলংকরণ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত প্রণবেশ মাইতি দেবব্রত ঘোষ
অলয় ঘোষাল শংকর বসাক সুব্রত মাজী

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

হিরণ লাইব্রেরি
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি
রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা
জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
বিদ্যাসাগর পত্রপত্রিকা সংগ্রহশালা, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

পৃষ্ঠা ১

বোঝাপড়া — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণ ভরিয়ে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অদ্ভুত আতিথেয়তা — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
চন্দ্রগুপ্ত — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ২১

বনভোজনের ব্যাপার — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
মিলিয়ে পড়ো
নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ — নলিনী দাশ
সবুজ জামা — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চিঠি — মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মিলিয়ে পড়ো
আলাপ — পূর্ণেন্দু পত্রী

তৃতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ৪৯

পরবাসী — বিষ্ণু দে
পথচল্‌তি — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
একটি চড়ুই পাখি — তারাপদ রায়

চতুর্থ পাঠ

পৃষ্ঠা ৬২

দাঁড়াও
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছন্নছাড়া
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পল্লীসমাজ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গাঁয়ের বধূ
সলিল চৌধুরী

পঞ্চম পাঠ

পৃষ্ঠা ৮৩

গাছের কথা
জগদীশচন্দ্র বসু

হাওয়ার গান
বুদ্ধদেব বসু

কী করে বুঝব
আশাপূর্ণা দেবী

ষষ্ঠ পাঠ

পৃষ্ঠা ১০৩

পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি
জীবনানন্দ দাশ

আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে
বিজয় সরকার

নাটোরের কথা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলিয়ে পড়ো
স্বাদেশিকতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গড়াই নদীর তীরে
জসীমউদ্দীন

সপ্তম পাঠ

পৃষ্ঠা ১১৯

জেলখানার চিঠি
সুভাষচন্দ্র বসু

স্বাধীনতা
ল্যাংস্টন হিউজ

আদাব
সমরেশ বসু

ভয় কি মরণে
মুকুন্দদাস

শিকল-পরার গান
কাজী নজরুল ইসলাম

অষ্টম পাঠ

পৃষ্ঠা ১৪৩

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মিলিয়ে পড়ো
ভালোবাসা কি বৃথা যায়?
শিবনাথ শাস্ত্রী

ঘুরে দাঁড়াও
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সুভা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবম পাঠ

পৃষ্ঠা ১৬৪

পরাজয়
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিপিসি
জয় গোস্বামী

টিকিটের অ্যালবাম
সুন্দর রামস্বামী

লোকটা জানলই না
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বই পড়ার কায়দা-কানুন ৪

শিখন পরামর্শ

পৃষ্ঠা ১৯২

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

অলংকরণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত প্রণবেশ মাইতি দেবব্রত ঘোষ অলয় ঘোষাল শংকর বসাক সুব্রত মাজী

বোঝাপড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে,
কতকটা যে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে
পরের ভোগে থাকবে বাকি,
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম—
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম!
মনেরে আজ কহ যে,

ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে?
ভেসে থাকতে পারো যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পারো তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।

এটা কিছু অপূর্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবই—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
তোমার মাপে হয়নি সবাই।
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারও ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে

সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোলো যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পারো সারো।
খুব খানিকটে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে ভাই, বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো—
ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হলো।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথাকাহিনী*, *সহজপাঠ*, *রাজর্ষি*,*ছেলেবেলা*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *হাস্যকৌতুক*, *ডাকঘর* প্রভৃতি রচনা শিশু ও কিশোর মনকে আলোড়িত করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে *Song Offerings*-এর জন্য এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত কোন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত লিখতেন?

১.২ ভারতের কোন প্রতিবেশী দেশে তাঁর লেখা গান জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ ‘সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়।’ — কোনটি সবার চেয়ে শ্রেয়?

২.২ ‘ঘটনা সামান্য খুবই।’ — কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে?

২.৩ ‘তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।’ — উদ্ধৃতিটির নিহিতার্থ স্পষ্ট করো।

২.৪ ‘মরণ এলে হঠাৎ দেখি / মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।’ — ব্যাখ্যা করো।

২.৫ ‘তাহারে বাদ দিয়েও দেখি / বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।’ — উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে জীবনের কোন সত্য প্রকাশ পেয়েছে?

২.৬ কীভাবে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে?

২.৭ ‘দোহাই তবে এ কার্যটা /যত শীঘ্র পারো সারো।’ — কবি কোন কার্যের কথা বলেছেন? সেই কার্যটি শীঘ্র সারতে হবে কেন?

২.৮ কখন আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালানো সম্ভব?

২.৯ ‘ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে / কতটুকুন তফাত হলো।’ — এই উদ্ধৃতির মধ্যে জীবনের চলার ক্ষেত্রে কোন পথের ঠিকানা মেলে?

২.১০ ‘অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি / এলে সুখের বন্দরেতে,’ — ‘ঝঞ্ঝা কাটিয়ে আসা’ বলতে কী বোঝো?

শব্দার্থ : মান্ধাতার আমল — রাবণরাজার সমসাময়িক মান্ধাতার যুগ বা অতি প্রাচীনকাল। আর্তরবে — কাতর ধ্বনিতে। শ্রেয় — সংগত, উপযুক্ত। ডাগর — দীর্ঘ, বড়ো।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৩.১ 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক / সত্যেরে লও সহজে।' — তুমি কি কবির সঙ্গে একমত? জীবনে চলার পথে নানা বাধাকে তুমি কীভাবে অতিক্রম করতে চাও?

৩.২ 'মনেরে আজ কহ যে, / ভালো মন্দ যাহাই আসুক / সত্যেরে লও সহজে।' — কবির মতো তুমি কি কখনও মনের সঙ্গে কথা বলো? সত্যকে মেনে নেবার জন্য মনকে তুমি কীভাবে বোঝাবে — একটি পরিস্থিতি কল্পনা করে বুঝিয়ে লেখো।

৩.৩ 'তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।' — 'তেমন করে' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও। এখানে কবি কী ধরনের সুখের ইঙ্গিত করেছেন — লেখো।

৪. **নীচের শব্দগুলির দল বিশ্লেষণ করে মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল চিহ্নিত করো :**

বোঝাপড়া, কতকটা, সত্যেরে, পাঁজরগুলো, বিশ্বভুবন, অশ্রুসাগর।

৫. **নীচের প্রতিটি শব্দের তিনটি করে সমার্থক শব্দ লেখো :**

মন, জখম, ঝঞ্ঝা, ঝগড়া, সামান্য, শঙ্কা, আকাশ।

৬. **নীচের প্রতিটি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে শব্দজোড় তৈরি করে বাক্য রচনা করো :**

আঁধার, সত্য, দোষ, আকাশ, সুখ।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

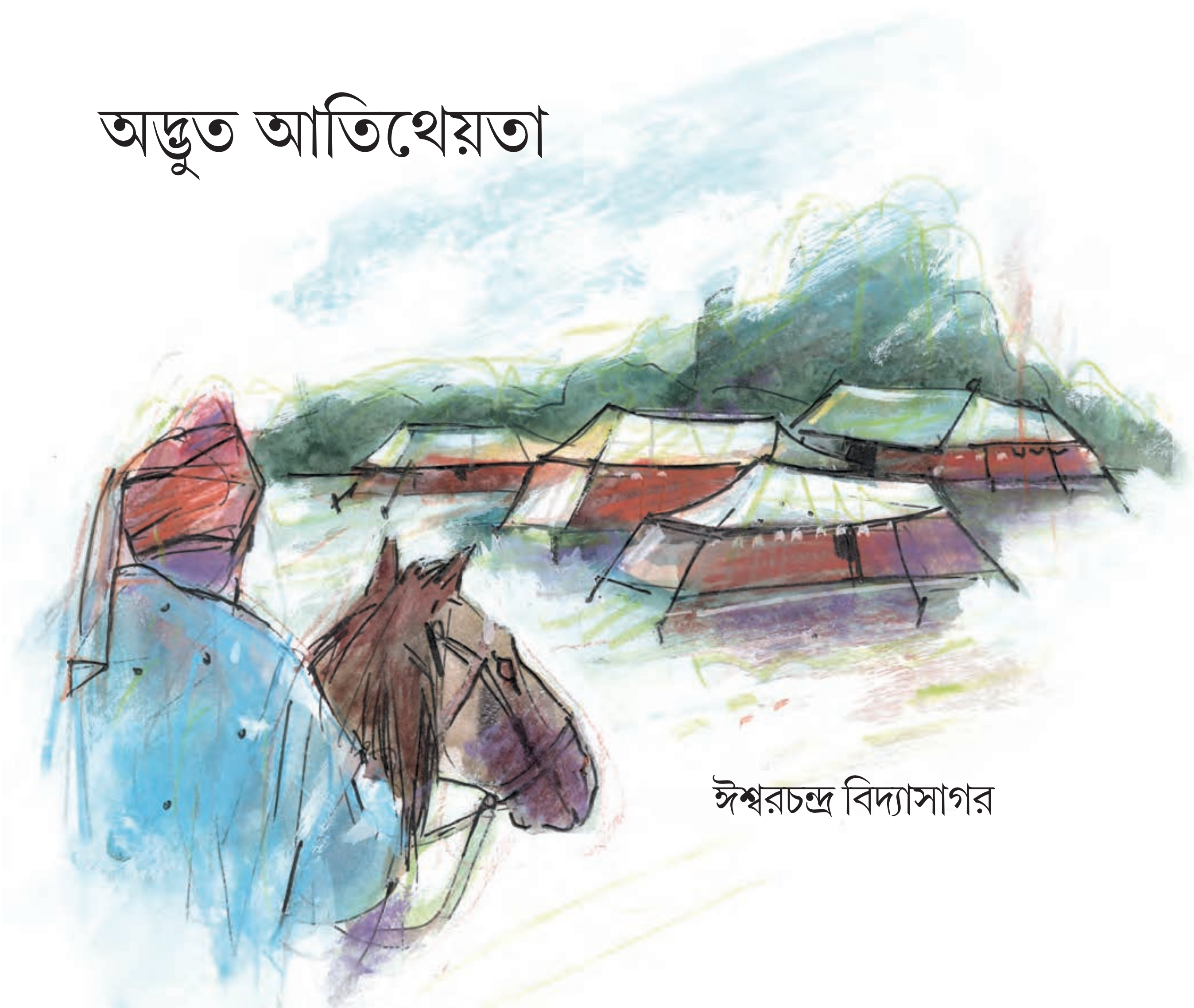

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একদা আরব জাতির সহিত মুরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা বহুদূর পর্যন্ত এক মুরসেনাপতির অনুসরণ করে; তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য, দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনো ক্রমেই অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি, এক আরবসেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয়-প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্যা করেন; সে ব্যক্তি শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষপ্রদর্শন বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরবসেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া, আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মুরসেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তিপরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা, পরস্পর স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সহসা আরবসেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই মুরসেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া, আপনকার পরিচর্যা করিতে পারিলাম না; আহারসামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে, তাহাতে আপনি কোনোক্রমেই নিরুদ্‌বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যুষে, এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া, পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেক; আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কী কারণে আরবসেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্মগ্রহ করিতে না পারিয়া, মুরসেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহানচিত্তে শয়ন করিলেন। রজনীশেষে, আরব সেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল, এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আহার প্রস্তুত। সেনাপতি শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক, মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া, আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরবসেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না; পরে, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরবসেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মুরসেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন; এই বিপক্ষশিবির-মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে, আমরা উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি, স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের বৃত্তান্তবর্ণন করিতে করিতে, আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র, বৈরসাধন বাসনার বশবর্তী হইয়া, বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই; আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না। কিন্তু আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই, আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক এবং সেই মুহূর্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া, বিপক্ষভাবে

আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নহে; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরবসেনাপতি, সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দন পূর্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরবসেনাপতিও, সূর্যোদয়দর্শনমাত্র, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মুরসেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত পূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী। এজন্য, তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। আরবসেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধন সংকল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

হাতেকলমে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) : জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে *বিদ্যাসাগর* উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ছাড়াও বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ-রোধ ইত্যাদি বহুবিধ সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনূদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে *আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, কথামালা , বর্ণ পরিচয়, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, প্রভাবতী সম্ভাষণ* উল্লেখযোগ্য। পাঠ্য আখ্যানটি তাঁর *আখ্যানমঞ্জরী* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন?
১.২ তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

২.১ 'অদ্ভুত আতিথেয়তা' গল্পে কোন কোন সেনাপতির প্রসঙ্গ রয়েছে?
২.২ 'তিনি, এক আরবসেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।' — উদ্ধৃতাংশে 'তিনি' বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে?
২.৩ 'উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল।' — 'উভয় সেনাপতি' বলতে এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?
২.৪ 'তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।' — প্রাণরক্ষার কোন উপায় বক্তা এক্ষেত্রে বলেছেন?
২.৫ 'আপনি সত্বর প্রস্থান করুন।' — বক্তা কেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে 'সত্বর প্রস্থান' করার নির্দেশ দিলেন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো:**

৩.১ 'তাঁহার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল।' — এখানে কার কথা বলা হয়েছে? দিক্‌ভ্রম হওয়ার পরিণতি কী হলো?
৩.২ 'আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে।' — এই বক্তব্যের সমর্থন গল্পে কীভাবে খুঁজে পেলে?
৩.৩ 'সহসা আরবসেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।' — আরবসেনাপতির মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে ওঠার কারণ কী?
৩.৪ 'সন্দিহানচিত্তে শয়ন করিলেন।' — এখানে কার মনের সন্দেহের কথা বলে হয়েছে? তাঁর মনের এই সন্দেহের কারণ কী?
৩.৫ '... তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল...' — কে, কাকে অনুসরণ করছিলেন? তাঁর এই অনুসরণের কারণ কী?

৪. **প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো :**

৪.১ 'যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।'
৪.২ 'এই বিপক্ষ শিবির-মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই।'
৪.৩ 'আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না।'

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৫.১ গল্পে কার আতিথেয়তার কথা রয়েছে? তিনি কীভাবে অতিথির আতিথেয়তা করেন? তাঁর সেই আতিথেয়তাকে 'অদ্ভুত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে কেন?

৫.২ আরব - মুর সংঘর্ষের ইতিহাসাশ্রিত কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই আখ্যানে লেখকের রচনাশৈলীর অনন্যতার পরিচয় দাও।

৫.৩ 'আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীর কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে।' — গল্পের ঘটনা বিশ্লেষণ করে মন্তব্যটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো।

৫.৪ 'বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল।' — কোন দুই সেনাপতির কথা এখানে বলা হয়েছে? তাঁদের কীভাবে সাক্ষাৎ ঘটেছিল? উভয়ের কথোপকথনের সারমর্ম নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৫.৫ 'তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশ স্থানে উপস্থিত হইলেন।' — কার কথা বলা হয়েছে? কীভাবে তিনি স্বপক্ষের শিবিরে নির্বিঘ্নে পৌঁছলেন? তাঁর জীবনের এই ঘটনার পূর্বরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৫.৬ 'তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন...' —কার কথা বলা হয়েছে? তিনি কাকে অনুসরণ করছিলেন? তাঁর এই অনুসরণের কারণ কী? শত্রুকে কাছে পেয়েও তিনি 'বৈরসাধন সংকল্প' সাধন করেননি কেন?

শব্দার্থ : বৈরসাধন —শত্রুতা। স্বপক্ষীয় — নিজের দলের। পটমণ্ডপদ্বারে — তাঁবুর (বস্ত্রদ্বারা নির্মিত) দরজায়। বিপক্ষতাচরণ — বিপক্ষের মতো আচরণ। ক্ষুন্নিবৃত্তি — ক্ষুধার নিবৃত্তি। গাত্রোত্থান — উঠে দাঁড়ানো। মর্মগ্রহ—তাৎপর্যবোধ। মুখপ্রক্ষালনাদি — মুখ ধোওয়া ইত্যাদি।

৬. নীচের শব্দগুলির দলবিশ্লেষণ করে মুক্তদল ও রুদ্ধদল চিহ্নিত করো :

সংগ্রাম, অশ্বপৃষ্ঠ, দণ্ডায়মান, করমর্দন , তৎক্ষণাৎ

৭. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

৭.১ আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। (জটিল বাক্যে)

৭.২ আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আবরদিগের তুল্য নহে। (ইতিবাচক বাক্যে)

৭.৩ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। (যৌগিক বক্যে)

৭.৪ এই বিপক্ষশিবির-মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৭.৫ তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। (না-সূচক বাক্যে)

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান॥
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান।।
আরো বেদনা আরো বেদনা,
প্রভু, দাও মোরে আরও চেতনা
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি 'গীতিবিতান' নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে 'স্বরবিতান' নামের বইয়ে।

চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্থান — সিন্ধু-নদতট; দূরে গ্রিক জাহাজ-শ্রেণি। কাল — সন্ধ্যা।

নদতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সূর্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কী বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মতো এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মতো তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

সেলুকস। সত্য সম্রাট।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মতো বক্র রেখায় পড়ে আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মতো নির্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ-কান্তি জাতি এই দেশ শাসন করছে, তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দি করে আনি যখন — সে কি বললে জানো?

সেলুকস। কী সম্রাট?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার কাছে কীরূপ আচরণ প্রত্যাশা করো?' — সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল, 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!' চমকিত হলাম! ভাবলাম — এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

সেলুকস। সম্রাট মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসি নাই। আমি এসেছি শৌখিন দিগ্‌বিজয়ে। জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে এ দিগ্‌বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট?

সেকেন্দার। সে দিগ্‌বিজয় সম্পূর্ণ করতে হলে নূতন গ্রিক সৈন্য চাই। — কী আশ্চর্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে চলে এসেছি! ঝঞ্ঝার মতো এসে মহাশত্রুসৈন্য ধূমরাশির মতো উড়িয়ে দিয়েছি। অর্ধেক এশিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়েছে। নিয়তির মতো দুর্বার, হত্যার মতো করাল, দুর্ভিক্ষের মতো নিষ্ঠুর আমি অর্ধেক এশিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম — সেই শতদ্রুতীরে।

চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনসের প্রবেশ।

সেকেন্দার। কী সংবাদ আন্টিগোনস? ও কে?

আন্টিগোনস। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আন্টিগোনস। আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কী লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পারলাম না। — তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কী লিখছিলে যুবক? সত্য বলো।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বলব। রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন —

সেকেন্দার। উত্তম। বলো কী লিখছিলে?

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহ রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধরে শিখছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। [চন্দ্রগুপ্তকে] তার পর?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রিক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কী অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে নহে।

সেকেন্দার। তবে —

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তারপর!

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুনলাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্তা। অর্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত করে নদনদীগিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম করে, শুনলাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত করেছেন। হে সম্রাট! আমার ইচ্ছা হলো যে দেখে আসি — কী সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্যের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচলিত হয়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা করছিলাম। আমার ইচ্ছা, শুদ্ধ আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন।

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রিক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা করতাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক?

আন্টিগোনস। কে বিশ্বাসঘাতক?

সেলুকস। এই যুবক।

আন্টিগোনস। এই যুবক, না তুমি?

সেলুকস। আন্টিগোনস? আমার বয়স না মানো, পদবি মেনে চলো।

আন্টিগোনস। জানি তুমি গ্রিক সেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। আন্টিগোনস!

তরবারি বাহির করিলেন

আন্টিগোনস ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আন্টিগোনস তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।

সেকেন্দার। নিরস্ত হও।

সেই মুহূর্তেই আন্টিগোনসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল।

সেকেন্দার। আন্টিগোনস!

আন্টিগোনস লজ্জায় শির অবনত করিলেন।

সেকেন্দার। আন্টিগোনস! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্ধা! — আমি এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্ধা হতে পারে' তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। — যাও, এই মুহূর্তেই তোমায় নির্বাসিত করলাম।

[আন্টিগোনসের প্রস্থান]

সেকেন্দার। আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো যে গ্রিক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রিক সেনাপতির শোভা পায় না — আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট!

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দি করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কী অপরাধে সম্রাট?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছ, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে!—ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহা বীর, দেখছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দি করো।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট আমায় বধ না করে বন্দি করতে পারবেন না।

তরবারি বাহির করিলেন

সেকেন্দার। [সোল্লাসে] চমৎকার! যাও আমি তোমায় বন্দি করব না। আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্‌বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃত রাজ্য উদ্ধার করবে। তুমি দুর্জয় দিগ্‌বিজয়ী হবে। যাও বীর! মুক্ত তুমি।

হাতে কলমে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) : প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম. এ পাশ করেন। কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে পাশ্চাত্য সংগীত শেখেন। অল্প বয়সে কাব্যরচনা শুরু করে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানত কাব্যই রচনা করেন। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনার মধ্যে *হাসির গান*, *চন্দ্রগুপ্ত*, *সাজাহান*, *মেবার পতন*, *প্রতাপসিংহ*, *নূরজাহান*, *সীতা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাঠ্য নাট্যাংশটি তাঁর *চন্দ্রগুপ্ত* নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি নাটকের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখো:**

২.১ নাট্যাংশটির ঘটনাস্থল ও সময় নির্দেশ করো।

২.২ নাট্যাংশে উল্লিখিত 'হেলেন' চরিত্রের পরিচয় দাও।

২.৩ 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ।' — উদ্ধৃতাংশের বক্তা কে?

২.৪ 'জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই' — বক্তা কীভাবে এই কীর্তি রেখে যেতে চান?

২.৫ 'সম্রাট, আমায় বধ না করে বন্দি করতে পারবেন না।' — বক্তাকে 'বন্দি' করার প্রসঙ্গ এসেছে কেন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:**

৩.১ 'কী বিচিত্র এই দেশ!' — বক্তার চোখে এই দেশের বৈচিত্র্য কীভাবে ধরা পড়েছে?

৩.২ ভাবলাম — এ একটা জাতি বটে!' — বক্তা কে? তাঁর এমন ভাবনার কারণ কী?

৩.৩ 'এ দিগ্‌বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট?' — এ প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট কী জানালেন?

৩.৪ 'ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।' — বক্তা কে? কোন সত্য সে উচ্চারণ করেছে?

৩.৫ 'আমার ইচ্ছা হলো যে দেখে আসি...' — বক্তার মনে কোন ইচ্ছে জেগে উঠেছিল? তার পরিণতিই বা কী হয়েছিল?

৪. নীচের উদ্ধৃত অংশগুলির প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য আলোচনা করো :

৪.১ ‘এ শৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে।’

৪.২ ‘সম্রাট মহানুভব’।

৪.৩ ‘বাধা পেলাম প্রথম — সেই শতদ্রুতীরে।’

৪.৪ ‘আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।’

৪.৫ ‘যাও বীর! মুক্ত তুমি।’

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৫.১ নাট্যাংশটি অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টিতে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় দাও।

৫.২ নাট্যাংশে ‘সেকেন্দার’ ও ‘সেলুকস’-এর পরিচয় দাও। সেকেন্দারের সংলাপে ভারত-প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ কীভাবে ধরা দিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করো।

৫.৩ ‘চমকিত হলাম।’ — কার কথায় বক্তা চমকিত হয়েছিলেন? তাঁর চমকিত হওয়ার কারণ কী?

৫.৪ ‘সম্রাট মহানুভব।’ — বক্তা কে? সম্রাটের ‘মহানুভবতা’-র কীরূপ পরিচয় নাট্যাংশে পাওয়া যায়?

৫.৫ ইতিহাসের নানান অনুষঙ্গ কীভাবে নাট্যকলেবরে বিধৃত রয়েছে তা ঘটনাধারা বিশ্লেষণ করে আলোচনা করো।

৫.৬ ‘গুপ্তচর।’ — কাকে ‘গুপ্তচর’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে? সে কি প্রকৃতই গুপ্তচর?

৫.৭ ‘সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন...’ — তাঁর এই ক্ষণেক দৃষ্টিপাতের কারণ কী?

৫.৮ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসের কীরূপ সম্বন্ধের পরিচয় নাট্যাংশে মেলে?

৫.৯ ‘তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।’ — কার উক্তি? সে কী লিখে নিচ্ছিল? তাঁর এই লিখে নেওয়ার উদ্দেশ্য কী?

৫.১০ আন্টিগোনস নাটকের এই দৃশ্যে সেলুকসকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলেছে। তোমার কি সেলুকসকে সত্যিই ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে মনে হয়? যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৫.১১ ‘নিরস্ত্র হও।’— কে এই নির্দেশ দিয়েছেন? কোন পরিস্থিতিতে তিনি এমন নির্দেশ দানে বাধ্য হলেন?

৫.১২ ‘আন্টিগোনস লজ্জায় শির অবনত করিলেন।’ — তাঁর এহেন লজ্জিত হওয়ার কারণ কী?

৫.১৩ নাট্যাংশ অবলম্বনে গ্রিক সম্রাট সেকেন্দারের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় দাও।

৫.১৪ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সেকেন্দারের কীরূপ মনোভাবের পরিচয় নাট্যদৃশ্যে ফুটে উঠেছে, তা উভয়ের সংলাপের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

শব্দার্থ : শিবির — সেনানিবাস/ছাউনি। প্রাবৃটে — বর্ষাকালে। জঙ্গমপর্বতসম — গতিশীল পর্বতের মতো। মদমত্ত মাতঙ্গ — উন্মত্ত হাতি। মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম — বড়ো শিংওয়ালা হরিণ। শকট — যান / গাড়ি। বৈমাত্র — বিমাতার সন্তান।

৬. নীচের বাক্যগুলি থেকে সন্ধিবন্ধ পদ খুঁজে নিয়ে সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

৬.১ আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

৬.২ বিশাল নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে।

৬.৩ সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিলো, ‘রাজার প্রতি রাজার আচরণ।’

৬.৪ আমি এসেছি শৌখিন দিগ্‌বিজয়ে।

৬.৫ তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার করবে।

৭. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

দৈত্যসৈন্য, নদনদী, স্নেহছায়া, অসম্পূর্ণ, বিজয়বার্তা, অভ্রভেদী।

৮. ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :

৮.১ হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।

৮.২ এই মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মতো তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

৮.৩ চমকিত হলাম।

৮.৪ আমার শিবিরে তুমি গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছ।

৮.৫ নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও।

৯. নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলির কারক-বিভক্তি নির্দেশ করো :

৯.১ কী বিচিত্র এই <u>দেশ</u>!

৯.২ আমি বিস্মিত <u>আতঙ্কে</u> চেয়ে থাকি।

৯.৩ মদমত্ত <u>মাতঙ্গ</u> জঙ্গমপর্বতসম মন্থর গতিতে চলেছে।

৯.৪ বাধা পেলাম প্রথম-সেই শতদ্রুতীরে।

৯.৫ আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

১০. নীচের শব্দগুলির দল বিশ্লেষণ করো :

স্থিরভাবে, নিষ্কম্পস্বরে, বিজয়বাহিনী, চন্দ্রগুপ্ত, আর্যকুলরবি।

১১. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

১১.১ নদতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন। (দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো)।

১১.২ 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করো?' (পরোক্ষ উক্তিতে)

১১.৩ জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই। (না-সূচক বাক্যে)

১১.৪ আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম। (সরল বাক্যে)

১১.৫ তোমার অপরাধ তত নয়। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১১.৬ এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্র হিসেবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। (নিম্নরেখ শব্দের বিশেষ্যরূপ ব্যবহার করে বাক্যটি লেখো)

১১.৭ 'কী বিচিত্র এই দেশ'! (নির্দেশক বাক্যে)

১১.৮ 'সত্য সম্রাট'। (না-সূচক বাক্যে)

১১.৯ এ দিগ্‌বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট? (পরোক্ষ উক্তিতে)

১১.১০ 'ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।' (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১১.১১ আমি এরূপ বুঝি নাই। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১১.১২ 'সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তাহা ভাবি নাই।' (নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দের বিশেষ্যের রূপ ব্যবহার করো)

১১.১৩ সম্রাট আমায় বধ না করে বন্দি করতে পারবেন না। (যৌগিক বাক্যে)

১১.১৪ আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। (জটিল বাক্যে)

১১.১৫ 'নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও'। (না-সূচক বাক্যে)

বনভোজনের ব্যাপার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হাবুল সেন বলে যাচ্ছিল—পোলাও, ডিমের ডালনা, রুই মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা—

উস-উস শব্দে নোলার জল টানল টেনিদা : বলে যা—থামলি কেন? মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি পোলাও, মশলদা দোসে, চাউ-চাউ, সামি কাবাব—

এবার আমাকে কিছু বলতে হয়। আমি জুড়ে দিলাম : আলু ভাজা, শুক্তো, বাটিচচ্চড়ি, কুমড়োর ছোকা—

টেনিদা আর বলতে দিলে না! গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল : থাম প্যালা, থাম বলছি। শুক্তো, বাটিচচ্চড়ি।—দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তার চেয়ে বল-না হিঞ্চে সেদ্ধ, গাঁদাল আর শিঙিমাছের ঝোল! পালা-জ্বরে ভুগিস আর বাসক পাতার রস খাস, এর চাইতে বেশি বুদ্ধি আর কী হবে তোর! দিব্যি অ্যায়সা অ্যায়সা মোগলাই খানার কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে ধাঁ করে নিয়ে এল বাটি চচ্চড়ি আর বিউলির ডাল! ধ্যাত্তোর!

ক্যাবলা বললে, পশ্চিমে কুঁদরুর তরকারি দিয়ে ঠেকুয়া খায়। বেশ লাগে!

—বেশ লাগে?—টেনিদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা লঙ্কা আর ছোলার ছাতু আরও ভালো লাগে না? তবে তাই খা-গে যা। তোদের মতো উল্লুকের সঙ্গে পিকনিকের আলোচনাও ঝকমারি!

হাবুল সেন বললেন, আহা-হা চৈইত্যা যাইত্যাছ কেন? পোলাপানে কয়—

— পোলাপান! এই গাড়লগুলোকে জলপান করলে তবে রাগ যায়! তাও কি খাওয়া যাবে এগুলোকে? নিম-নিসিন্দের চেয়েও অখাদ্য। এই রইল তোদের পিকনিক—আমি চললাম! তোরা ছোলার ছাতু আর কাঁচা লঙ্কার পিন্ডি গেল গেয়ে—আমি ওসবের মধ্যে নেই!

সত্যিই চলে যায় দেখছি! আর দলপতি চলে যাওয়া মানেই আমরা একেবারে অনাথ! আমি টেনিদার হাত চেপে ধরলাম : আহা, বোসো-না। একটা প্ল্যান-ট্যান হোক। ঠাট্টাও বোঝো না।

টেনিদা গজগজ করতে লাগল : ঠাট্টা! কুমড়োর ছোকা আর কুঁদরুর তরকারি নিয়ে ওসব বিচ্ছিরি ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

—না,—না, ওসব কথার কথা—হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বোঝাতে লাগল : মোগলাই খানা না হইলে আর পিকনিক হইল কী?

—তবে লিস্টি কর—টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।

প্রথমে যে লিস্টটা হলো তা এইরকম :

বিরিয়ানি পোলাও
কোর্মা
কোপ্তা
কাবাব (দু-রকম)
মাছের চপ

—মাঝখানে বেরসিকের মতো বাধা দিলে ক্যাবলা : তাহলে বাবুর্চি চাই, একটা চাকর, একটা মোটর লরি, দুশো টাকা—

—দ্যাখ ক্যাবলা—টেনিদা ঘুসি বাগাতে চাইল।

আমি বললাম, চটলে কী হবে? চারজনে মিলে চাঁদা উঠেছে দশ টাকা ছ-আনা।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, তাহলে একটু কমসম করেই করা যাক। ট্যাঁক-খালির জমিদার সব—তোদের নিয়ে ভদ্দরলোকে পিকনিক করে!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি দিয়েছ ছ-আনা, বাকি দশ টাকা গেছে আমাদের তিনজনের পকেট থেকে। কিন্তু বললেই গাঁট্টা। আর সে গাঁট্টা ঠাট্টার জিনিস নয়—জুতসই লাগলে স্রেফ গালপাট্টা উড়ে যাবে।

রফা করতে করতে শেষপর্যন্ত লিস্টটা যা দাঁড়াল তা এই :

খিচুড়ি (প্যালা রাজহাঁসের ডিম আনিবে বলিয়াছে)
আলু ভাজা (ক্যাবলা ভাজিবে)
পোনা মাছের কালিয়া (প্যালা রাঁধিবে)
আমের আচার (হাবুল দিদিমার ঘর হইতে হাতসাফাই করিবে)
রসগোল্লা, লেডিকেনি (ধারে 'ম্যানেজ' করিতে হইবে)

লিস্টি শুনে আমি হাঁড়িমুখ করে বললাম, ওর সঙ্গে আর-একটা আইটেম জুড়ে দে হাবুল। টেনিদা খাবে।

—হেঁ—হেঁ—প্যালার মগজে শুধু গোবর নেই, ছটাকখানেক ঘিলুও আছে দেখছি। বলেই টেনিদা আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। 'গেছি গেছি' বলে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

আমরা পটলডাঙার ছেলে—কিছুতেই ঘাবড়াই না। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গন্ডায়গন্ডায় হাতি-গন্ডার সাবাড় করে থাকি। তাই বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছিলাম, দূর-দূর। হাঁসের ডিম খায় ভদ্দরলোক! খেতে হলে রাজহাঁসের ডিম। রীতিমতো রাজকীয় খাওয়া!

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে শুনি? খুব যে চালিয়াতি করছিস, তুই ডিম পাড়বি নাকি?—টেনিদা জানতে চেয়েছিল।

—আমি পাড়তে যাব কোন দুঃখে? কী দায় আমার?—আমি মুখ ব্যাজার করে বলেছিলাম : হাঁসে পাড়বে।

—তাহলে সেই হাঁসের কাছ থেকে ডিম তোকেই আনতে হবে। যদি না আনিস, তাহলে—

তাহলে কী হবে বলবার দরকার ছিল না। কিন্তু কী গেরো বলো দেখি। কাল রবিবার—ভোরের গাড়িতেই আমরা বেরুব পিকনিকে। আজকের মধ্যেই রাজহাঁসের ডিম জোগাড় করতে না পারলে তো গেছি। পাড়ায় ভন্টাদের বাড়ি রাজহাঁস আছে গোটাকয়েক। ডিম-টিমও তারা নিশ্চয় পাড়ে। আমি ভন্টাকেই পাকড়ালাম। কিন্তু কী খলিফা ছেলে ভন্টা! দু-আনার পাঁঠার ঘুগনি আর ডজনখানেক ফুলুরি সাবড়ে তবে মুখ খুলল!

—ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্স থেকে।

—তুই দে না ভাই এনে। একটা আইসক্রিম খাওয়াব। ভন্টা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, নিজেরা পোলাও-মাংস সাঁটাবেন আর আমার বেলায় আইসক্রিম! ওতে চলবে না। ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও—আমি বাবা ময়লা ঘাঁটতে পারব না। কী করি, রাজি হতে হলো।

ভন্টা বললে, দুপুরবেলায় আসিস। বাবা-মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। মা তখন ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। সেইসময় ডিম বের করে দেবো!

গেলাম দুপুরে। উঠোনের একপাশে কাঠের বাক্স—তার ভিতরে সার-সার খুপরি।
গোটা-দুই হাঁস ভিতরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে। ভন্টা বললে, যা—নিয়ে আয়।

কিন্তু কাছে যেতেই বিতিকিচ্ছিরিভাবে ফ্যাস-ফ্যাস করে উঠল হাঁস দুটো।

ফোঁস-ফোঁস করছে যে!

ভন্টা উৎসাহ দিলে : ডিম নিতে এসেছিস—একটু আপত্তি করবে না? তোর কোনো ভয় নেই প্যালা—দে হাত ঢুকিয়ে।

হাত ঢুকিয়ে দেবো? কিন্তু কী বিচ্ছিরি ময়লা!—ময়লা আর কী বদখত গন্ধ! একেবারে নাড়ি উলটে আসে। তার ওপরে যে-রকম ঠোঁট ফাঁক করে ভয় দেখাচ্ছে—

ভন্টা বললে, চিয়ার আপ প্যালা। লেগে যা!

যা থাকে কপালে বলে যেই হাত ঢুকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে—ওরে বাপরে! খটাং করে হাঁসটা হাত কামড়ে ধরল। সে কী কামড়! হাঁই-মাই করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

—কী হয়েছে রে ভন্টা, নীচে এত গোলমাল কীসের?—ভন্টার মা-র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমি আর নেই। হ্যাঁচকা টানে হাঁসের ঠোঁট থেকে হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় লাগালাম।
দরদর করে রক্ত পড়ছে তখন।

রাজহাঁস এমন রাজকীয় কামড় বসাতে পারে কে জানত। কিন্তু কী ফেরেববাজ ভন্টাটা।
জেনে-শুনে ব্রাহ্মণের রক্তপাত ঘটাল। আচ্ছা—পিকনিকটা চুকে যাক—দেখে নেব তারপর। ওই পাঁঠার ঘুগনি আর ফুলুরির শোধ তুলে ছাড়ব।

কী করা যায়—গাঁটের পয়সা দিয়ে মাদ্রাজি ডিমই কিনতে হলো গোটাকয়েক।

পরদিন সকালে শ্যামবাজার ইস্টিশানে পৌঁছে দেখি, টেনিদা, ক্যাবলা আর হাবুল এর মধ্যেই মার্টিনের রেলগাড়িতে চেপে বসে আছে। সঙ্গে একরাশ হাঁড়ি-কলশি, চালের পুঁটুলি, তেলের ভাঁড়। গাড়িতে গিয়ে উঠতে টেনিদা হাঁক ছাড়ল : এনেছিস রাজহাঁসের ডিম?

দুর্গা নাম করতে করতে পুঁটলি খুলে দেখালাম।

—এর নাম রাজহাঁসের ডিম। ইয়ার্কি পেয়েছিস?—টেনিদা গাঁট্টা বাগাল।

আমি গাড়ির খোলা দরজার দিকে সরে গেলাম : মানে—ইয়ে, ছোটো রাজহাঁস কিনা—

—ছোটো রাজহাঁস! কী পেয়েছিস আমাকে শুনি? পাগল না পেটখারাপ?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। ডিম তো আনছে!

টেনিদা গর্জন করে বললে, ডিম এনেছে না কচু। এই তোকে বলে রাখছি প্যালা—ডিমের ডালনা থেকে তোর নাম কেটে দিলাম। এক টুকরো আলু পর্যন্ত নয়, একটু ঝোলও নয়!

মন খারাপ করে আমি বসে রইলাম। ডিমের ডালনা আমি ভীষণ ভালোবাসি, তাই থেকেই আমাকে বাদ দেওয়া! আচ্ছা বেশ, খেয়ো তোমরা। এমন নজর দেবো পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে তোমাদের।

পিঁ করে বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল মার্টিনের রেল। তারপর ধ্বস-ধ্বস ভোঁস-ভোঁস করে এর রান্নাঘর, ওর ভাঁড়ারঘরের পাশ দিয়ে গাড়ি চলল।

টেনিদা বললে, বাগুইআটি ছাড়িয়ে আরও চারটে ইস্টিশান। তার মানে প্রায় এক ঘণ্টার মামলা। লেডিকেনির হাঁড়িটা বের কর, ক্যাবলা।

ক্যাবলা বললে, এখুনি! তাহলে পৌঁছোবার আগেই যে সাফ হয়ে যাবে?

টেনিদা বললে, সাফ হবে কেন, দুটো-একটা চেখে দেখব শুধু। আমার বাবা ট্রেনে চাপলেই খিদে পায়। এই একঘণ্টা ধরে শুধু শুধু বসে থাকতে পারব না। বের কর হাঁড়ি—চটপট—

হাঁড়ি চটপটই বেরুল—মানে, বেরুতেই হলো তাকে। তারপর মার্টিনের রেলের চলার তালে তালে ঝটপট করে সাবাড় হয়ে চলল। আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন জুল-জুল করে শুধু তাকিয়েই রইলাম। একটা লেডিকেনি চেখে দেখতে আমরাও যে ভালোবাসি, সেকথা আর মুখ ফুটে বলাই গেল না।

ইস্টিশান থেকে নেমে প্রায় মাইলখানেক হাঁটবার পরে ক্যাবলার মামার বাড়ি। কাঁচা রাস্তা, এঁটেল মাটি, তার ওপর কাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে আবার। আগে থেকেই রসগোল্লার হাঁড়িটা বাগিয়ে নিলে টেনিদা।

—এটা আমি নিচ্ছি। বাকি মোটঘাটগুলো তোরা নে।

—রসগোল্লা বরং আমি নিচ্ছি, তুমি চালের পোঁটলাটা নাও টেনিদা।

লেডিকেনির পরিণামটা ভেবে আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

টেনিদা চোখ পাকাল : খবরদার প্যালা, ওসব মতলব ছেড়ে দে। টুপটাপ করে দু-চারটে গালে ফেলবার বুদ্ধি, তাই নয়? হুঁ-হুঁ বাবা—চালাকি ন চলিষ্যতি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঁটরি-বোঁচকা কাঁধে ফেলে আমরা তিনজনেই এগোলাম।

কিন্তু তিন পাও যেতে হলো না। তার আগেই ধাঁই—ধপাস। টেনে একখানা রাম-আছাড় খেলো হাবুল।

—এই খেয়েছে কচুপোড়া।—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

সারা গায়ে কাদা মেখে হাবুল উঠে দাঁড়াল। হাতের ডিমের পুঁটলিটা তখন কুঁকড়ে এতটুকু—হলদে রস গড়াচ্ছে তা থেকে।

ক্যাবলা বললে, ডিমের ডালনার বারোটা বেজে গেল।

তা গেল। করুণ চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। ইস—এত কষ্টের ডিম। ওরই জন্যে রাজহাঁসের কামড় পর্যন্ত খেতে হয়েছে।

টেনিদা হুংকার দিয়ে উঠল : দিলে সব পণ্ড করে। এই ঢাকাই বাঙালটাকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে। পিটিয়ে ঢাকাই পরোটা করলে তবে রাগ যায়।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, হাবুল চার টাকা চাঁদা দিয়েছে—তার আগেই কী যেন একটা হয়ে গেল! হঠাৎ মনে হলো আমার পা দুটো মাটি ছেড়ে শোঁ করে শূন্যে উড়ে গেল, আর তারপরেই—

কাদা থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমার মাথা-মুখ বেয়ে আচারের তেল গড়াচ্ছে। ওই অবস্থাতেই চেটে দেখলাম একটুখানি। বেশ ঝাল-ঝাল টক-টক—বেড়ে আচারটা করেছিল হাবুলের দিদিমা!

ক্যাবলা আবার ঘোষণা করলে, আমের আচারের একটা বেজে গেল।

টেনিদা খেপে বললে, চুপ কর বলছি ক্যাবলা—এক চড়ে গালের বোম্বা উড়িয়ে দেবো।

কিন্তু তার আগেই টেনিদার বোম্বা উড়ল—মানে স্রেফ লম্বা হলো কাদায়। সাত হাত দূরে ছিটকে গেল রসগোল্লার হাঁড়ি—ধবধবে সাদা রসগোল্লাগুলো পাশের কাদাভরা খানায় গিয়ে পড়ে একেবারে নেবুর আচার।

ক্যাবলা বললে, রসগোল্লার দুটো বেজে গেল!

এবার আর টেনিদা একটা কথাও বললে না। বলবার ছিলই বা কী! রসগোল্লার শোকে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চারজনে পথ চলতে লাগলাম আমরা। টেনিদা তবু লেডিকেনিগুলো সাবাড় করেছে, কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কোথায়। অমন স্পঞ্জ রসগোল্লাগুলো।

পাঁচ মিনিট পরে টেনিদাই কথা কইল।

—তবু পোনা মাছগুলো আছে—কী বলিস! খিচুড়ির সঙ্গে মাছের কালিয়া আর আলুভাজা—নেহাত মন্দ হবে না—অ্যাঁ?

হাবুল বললে, হ-হ, সেই ভালো। বেশি খাইলে প্যাট গরম হইব। গুরুপাক না খাওয়াই ভালো।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল: শেয়াল বলেছিল, দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা।—ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে ছিল, তাই দুই-একটা হিন্দি শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে।

টেনিদা বলে খাট্টা! বেশি পাঁঠামি করবি তো চাঁট্টা বসিয়ে দেবো।

ক্যাবলা ভয়ে স্পিকটি নট। আমি তখনও নাকের পাশ দিয়ে ঝাল-ঝাল টক-টক তেল চাটছি। হঠাৎ বুক-পকেটটা কেমন ভিজে ভিজে মনে হলো। হাত দিয়ে দেখি, বেশ বড়োসড়ো এক-টুকরো আমের আচার তার ভেতরে কায়েমি হয়ে আছে।

—জয়গুরু! এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে সেটা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলাম।
সত্যি—হাবুলের দিদিমা বেড়ে আচার করেছিল! আরো গোটাকয়েক যদি ঢুকত!

বাগানবাড়িতে পৌঁছোলাম আরো পনেরো মিনিট পরে।

চারিদিকে সুপুরি আর নারকেলের বাগান—একটা পানা-ভরতি পুকুর, মাঝখানে, একতলা বাড়িটা। কিন্তু ঘরে চাবিবন্ধ। মালিটা কোথায় কেটে পড়েছে, কে জানে!

টেনিদা বললে, কুছ পরোয়া নেই। চুলোয় যাক মালি। বলং বলং বাহুবলং—নিজেরা উনুন খুঁড়ব—খড়ি কুড়ুব, রান্না করব—মালি ব্যাটা থাকলেই তো ভাগ দিতে হতো। যা হাবুল ইট কুড়িয়ে আন—উনুন করতে হবে। প্যালা, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়,—ক্যাবলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যা।

—আর তুমি?—আমি ফস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

—আমি?—একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে টেনিদা হাই তুলল : আমি এগুলো সব পাহারা দিচ্ছি। সবচাইতে কঠিন কাজটাই নিলাম আমি। শেয়াল কুকুর এলে তাড়াতে হবে তো।—যা তোরা—হাতে হাতে বাকি কাজগুলো চটপট সেরে আয়।

কঠিন কাজই বটে! ইস্কুলের পরীক্ষার গার্ডদেরও অমনি কঠিন কাজ করতে হয়। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষতে গিয়ে যখন 'ঘোড়া-ঘোড়া ঘাস-ঘাস' নিয়ে আমাদের দম আটকাবার জো, তখন গার্ড মোহিনীবাবুকে টেবিলে পা তুলে দিয়ে 'ফোঁরর-ফোঁ' শব্দে নাক ডাকাতে দেখছি।

টেনিদা বললে, যা—যা সব—দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঝাঁ করে রান্নাটা করে ফ্যাল—বড্ড খিদে পেয়েছে।

তা পেয়েছে বইকি। পুরো এক হাঁড়ি লেডিকেনি এখনও গজগজ করছে পেটের ভিতর। আমাদের বরাতেই শুধু অষ্টরম্ভা। প্যাঁচার মতো মুখ করে আমরা কাঠ খড়ি সব কুড়িয়ে আনলাম।

টেনিদা লিস্টি বার করে বললে, মাছের কালিয়া—প্যালা রাঁধিবে।

আমাকে দিয়েই শুরু। আমি মাথা চুলকে বললাম, খিচুড়ি-টিচুড়ি আগে হয়ে যাক—তবে তো?

—খিচুড়ি লাস্ট আইটেম—গরম গরম খেতে হবে। কালিয়া সকলের আগে। নে প্যালা—লেগে যা—

ক্যাবলার মা মাছ কেটে নুন-টুন মাখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষা। কড়াইতে তেল চাপিয়ে আমি মাছ ঢেলে দিলাম তাতে।

আরে—এ কী কাণ্ড! মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কড়াই-ভরতি ফেনা। তারপরেই আর কথা নেই—অতগুলো মাছ তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। মাছের কালিয়া নয়—মাছের হালুয়া।

ক্যাবলা আদালতের পেয়াদার মতো ঘোষণা করল : মাছের কালিয়ার তিনটে বেজে গেল।

—তবে রে ইস্টুপিড—। টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা তেলে মাছ দিয়ে তুই কালিয়া রাঁধছিস? এবার তোর পালাজ্বরের পিলেরই একদিন কি আমারই একদিন।

এ তো মার্টিনের রেল নয়—সোজা মাঠের রাস্তা। আমার কান পাকড়াবার জন্যে টেনিদার হাতটা এগিয়ে আসবার আগেই আমি হাওয়া। একেবারে পাঞ্জাব মেলের স্পিডে।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, খিচুড়ির লিস্ট থেকে প্যালার নাম কাটা গেল।

তা যাক। কপালে আজ হরিমটর আছে সে তো গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি। গোমড়া মুখে একটা আমড়া-গাছতলায় এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

বসে বসে কাঠপিঁপড়ে দেখছি, হঠাৎ গুটি গুটি হাবুল আর ক্যাবলা এসে হাজির।

—কী রে, তোরাও?

ক্যাবলা ব্যাজার মুখে বললে, খিচুড়ি টেনিদা নিজেই রাঁধবে। আমাদের আরও খড়ি আনতে পাঠাল।

সেই মুহূর্তেই হাবুল সেনের আবিষ্কার! একেবারে কলম্বাসের আবিষ্কার যাকে বলে।

---এই প্যালা---দ্যাখছস? ওই গাছটায় কীরকম জলপাই পাকছে!

আর বলতে হলো না। আমাদের তিনজনের পেটেই তখন খিদেয় ইঁদুর লাফাচ্ছে। জলপাই—জলপাই-ই সই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে উঠে পড়লাম—আহা—টক-টক—মিঠে-মিঠে জলপাই—যেন অমৃত।

হাবুলের খেয়াল হলো প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

—এই, টেনিদার খিচুড়ি কী হইল?

ঠিক কথা—খিচুড়ি তো এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত। তড়াক করে গাছ থেকে নেমে পড়ল ওরা। হাতের কাছে পাতা-টাতা যা পেলে, তাই নিয়ে ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে, আশায় আশায়। মুখে যাই বলুক—এক হাতা খিচুড়িও কি আমায় দেবে না? প্রাণ কি এত পাষাণ হবে টেনিদার?

কিন্তু খানিক দূরে এগিয়ে আমরা তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ!

টেনিদা সেই নারকেল গাছটায় হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে বলছে, দে—দে ক্যাবলা, পিঠটা আর একটু ভালো করে চুলকে দে।

পিঠ চুলকে দিচ্ছে—সন্দেহ কী। কিন্তু সে ক্যাবলা নয়—একটা গোদা বানর। আর চার-পাঁচটা গোল হয়ে বসেছে টেনিদার চারিদিকে। কয়েকটা তো মুঠো-মুঠো চাল-ডাল মুখে পুরছে, একটা আলুগুলো সাবাড় করছে আর আস্তে আস্তে টেনিদার পিঠ চুলকে দিচ্ছে। আরামে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে টেনিদা, থেকে থেকে বলছে, দে ক্যাবলা, আর একটু ভালো করে চুলকে দে!

এবার আমরা তিনজনেই গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম! টেনিদা—বাঁদর—বাঁদর!

—কী! আমি বাঁদর!—বলেই টেনিদা হাঁ করে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গেই বাপ বাপ বলে চিৎকার!

—ইঁ-ইঁ—ক্লিচ-ক্লিচ! কিচ-কিচ!

চোখের পলকে বানরগুলো কাঁঠাল গাছের মাথায়। চাল-ডাল-আলুর পুঁটলিও সেইসঙ্গে। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে তরিবত করে খেতে লাগল—সেইসঙ্গে কী বিচ্ছিরি ভেংচি! ওই ভেংচি দেখেই না লঙ্কার রাক্ষসগুলো ভয় পেয়ে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল।

পুকুরের ঘাটলায় চারজনে আমরা পাশাপাশি চুপ করে বসে রইলাম। যেন শোকসভা।

খানিক পরে ক্যাবলাই স্তব্ধতা ভাঙল।

— বনভোজনের চারটে বাজল।

— তা বাজল।—টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : কিন্তু কী করা যায় বলতো প্যালা? সেই লেডিকেনিগুলো কখন হজম হয়ে গেছে—পেট চুঁই-চুঁই করছে খিদেয়।

অগত্যা আমি বললাম বাগানে একটি গাছে জলপাই পেকেছে, টেনিদা—

—জলপাই! ইউরেকা! বনে ফলভোজন— সেইটেই তো আসল বনভোজন। চল চল, শিগগির চল!

লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল।

হাতে কলমে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭—১৯৭০) : জন্ম দিনাজপুরে। দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল এবং কলকাতায় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—*বীতংস, দুঃশাসন, ভোগবতী* প্রভৃতি। *উপনিবেশ, বৈজ্ঞানিক, শিলালিপি, লালমাটি, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, পদসঞ্চার* তাঁর রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস। শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সৃষ্টি টেনিদা চরিত্র।

১.১ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের কোন বিখ্যাত চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা?

১.২ তাঁর লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ বনভোজনের উদ্যোগ কাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল?

২.২ বনভোজনের জায়গা কোথায় ঠিক হয়েছিল?

২.৩ বনভোজনের জায়গায় কীভাবে যাওয়া যাবে?

২.৪ রাজহাঁসের ডিম আনার দায়িত্ব কে নিয়েছিল?

২.৫ বনভোজনের বেশিরভাগ সামগ্রী কারা সাবাড় করেছিল?

২.৬ কোন খাবারের কারণে বনভোজন ফলভোজনে পরিণত হলো?

শব্দার্থ : গেরো — গ্রন্থি, এখানে দুর্ভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত। খলিফা — ওস্তাদ। দ্রাক্ষাফল — আঙুর ফল। খাট্টা — টক।

৩. **নীচের শব্দগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করো :**

মোগলাই, রান্না, বৃষ্টি, পরীক্ষা, আবিষ্কার

৪. **নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :**

বিচ্ছিরি, প্ল্যান-ট্যান, লিস্টি, ভদ্দর, ইস্টুপিড

৫. **নীচের বাক্যগুলি প্রত্যেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে নিয়ে লেখো :**

৫.১ আর সে গাট্টা, ঠাট্টার জিনিস নয়— জুতসই লাগলে স্রেফ গালপাট্টা উড়ে যাবে।

৫.২ দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা।

৫.৩ আহা— হা চৈইত্যা যাইত্যাছ কেন?

৫.৪ এক চড়ে গালের বোম্বা উড়িয়ে দেব।

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

বনভোজন, দলপতি, বেরসিক, দ্রাক্ষাফল, রেলগাড়ি

৭. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

৭.১ লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল। (জটিল বাক্যে)

৭.২ চোখের পলকে বানরগুলো গাছের মাথায়। (জটিল বাক্যে)

৭.৩ দুপুরবেলায় আসিস। বাবা-মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। (একটি সরল বাক্যে)

৭.৪ ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও। (জটিল বাক্যে)

৭.৫ টেনিদা আর বলতে দিলে না। গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল। (একটি সরল বাক্যে)

৮. নীচের শব্দগুলির সমার্থক প্রবচনগুলি খুঁজে বের করো এবং তা দিয়ে বাক্যরচনা করো:

চুরি, নষ্ট হওয়া, পালানো, গোলমাল করে ফেলা, লোভ দেওয়া, চুপ থাকা

৯. টীকা লেখো :

কলম্বাস, লেডিকেনি, বিরিয়ানি, ইউরেকা

১০. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও :

১০.১ বনভোজনের প্রথম তালিকায় কী কী খাদ্যের উল্লেখ ছিল? তা বাতিল হলো কেন?

১০.২ বনভোজনের দ্বিতীয় তালিকায় কী কী খাদ্যের উল্লেখ ছিল এবং কে কী কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল?

১০.৩ প্যালার রাজহাঁসের ডিম আনার ঘটনাটির বর্ণনা দাও।

১০.৪ ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে গিয়ে তাদের কী কী বিপদ ঘটেছিল?

১০.৫ ‘মাছের কালিয়ার তিনটি বেজে গেল’— মাছের কালিয়া সম্পর্কে এ রকম বলার কারণ কী?

১১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১১.১ এই গল্পটির নাম ‘বনভোজন’ না হয়ে ‘বনভোজনের ব্যাপার’ হলো কেন?

১১.২ এই গল্পে ক’টি চরিত্রের সঙ্গে তোমার দেখা হলো? প্রত্যেকটি চরিত্র নিয়ে আলোচনা করো।

১১.৩ এ গল্পটিতে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ভাষার দিক থেকে লেখক নানারকম কৌশল অবলম্বন করেছেন। কী কী কৌশল তুমি খেয়াল করেছ লেখো।

১১.৪ শীতকালে পিকনিক নিয়ে তোমার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখো/ গল্প লেখো।

১১.৫ টেনিদা-র মতো আরো কয়েকটি ‘দাদা’চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। এরকম তিনটি চরিত্র নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

মিলিয়ে পড়ো

নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ

নলিনী দাশ

বড়ো মিস বিশ্বাসের ক্লাস, বিষয়বস্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ, তাতে আবার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ ঘনিয়েছে। প্রাণপণে হাই চেপে ছুটির ঘণ্টার প্রতীক্ষায় আছি। এমন সময় ডেস্কের তলা দিয়ে একখানা দলা পাকানো কাগজ এসে আমার হাতে ঠেকল,— এমন চমকে গিয়েছিলাম যে আর একটু হলেই শব্দ করে ফেলতাম আর বকুনি খেতাম। পর-মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এ আমাদের 'গন্ডালু' দলের কোনো 'লু'-এর কাজ! ও বাবা, মিস বিশ্বাস যে আমার দিকেই তাকাচ্ছেন! তাড়াতাড়ি ভালো মানুষের মতো মুখ করে পড়ায় মন দিলাম। ভয় আর কৌতূহলের মধ্যে দ্বন্দ্বের শেষে কৌতূহলেরই জয় হলো, সাবধানে কোঁচকানো কাগজটা কোলের ওপর মেলে ধরলাম। ওমা! এ যে দেখি পদ্য— মালুর কীর্তি নিশ্চয়!

স্কুলে ভরতি হবার দিন কয়েক বাদেই মালু তার মাসির বাড়ি গিয়েছিল আর সেখান থেকেই কালুকে পদ্যে চিঠি লিখেছিল:

কালু ভাই, পেয়ে তোর পত্তোর
ভাবলাম 'দিতে হবে উত্তর'—

পেন নিয়ে বসে গেছি সত্বর,
চুল বেঁধে, করে সাজসজ্জা।।
হয় যদি কবিতাটা মন্দ
মিল ভাঙে, কেটে যায় ছন্দ,
তবু তোর হবে তো পছন্দ?
না হলেও নেই মোর লজ্জা।।

সেই থেকেই মালুর কবি-খ্যাতি সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের ক্লাসে উনিশটি মেয়ে ছিল বলে মালু সকলের নাম দিয়ে লম্বা একটি পদ্য লিখেছিল—
'ঊনবিংশতি-রত্ন-কথা।'

'বিক্রমাদিত্যোর সভাগৃহখানি
নটি রত্নের গুণে ভরেছিল জানি।
সংখ্যাটা আজি যদি বাড়ে, কিবা ক্ষতি?
রত্ন তো নটি নয়, ঊনবিংশতি
কলিকালে রাজসভা কোথা থেকে পাবে বলো?
ছোটো ক্লাসরুম তারা করে থাকে আলো।

প্রত্যেকটি মেয়ের নামে কয়েক ছত্র কবিতা লিখবার পরে নিজের বেলায় ফাঁকি দিয়েছিল—

'নিজ মুখে নিজ গুণ বলা নাহি যায়,
শরমেতে কালি মোর কলমে শুকায়!'

তারপর থেকে স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে, কাটা কুলগাছের শোকসভায় কী পরীক্ষার্থিনীদের সংবর্ধনায়, চাইতে না চাইতেই মালুর পদ্য প্রস্তুত!

মিস বিশ্বাসের চোখ এড়িয়ে কাগজটা ভালো করে দেখলাম— এ কী ব্যাপার আজ? এ তো কেবল মালুর লেখা নয়— বাদলা হাওয়ায় সকলের মনেই কবিত্ব জেগেছে দেখি আজ!

প্রথমেই অবশ্য মালুর লেখা :

'হে বোনেরা মোর
ঝরে আঁখি লোর,
    কিবা গাব আজ কহ—
পচা পচা ক্লাস
করে বারো মাস
জীবন দুর্বিষহ!
তার চে অদ্য,
লিখিয়া পদ্য,
সারা পিরিয়ড ধরি,

নিখিল বঙ্গ
কবিতা সংঘ
আমরা স্থাপন করি।’

সমস্ত কাগজখানা জুড়ে নানা রকম ছড়া। বড়ো বড়ো হরফে লেখা :—

‘আমরা দুজন আছি দলে
কাজল এবং বীণা বলে।’

তার পরে লাল পেনসিলে লেখা—

‘মোরা তোমাদের সংঘ
যোগ দেবো আজি রঙ্গে
লেখা যদি হলো মন্দ
করবিনে তো ভাই দ্বন্দ্ব?’

তারপর প্রায় ডজনখানেক সই — ক্লাসের কোনো মেয়েই বাদ পড়েনি দেখছি! এককোণে বুলু ছোটো ছোটো করে লিখেছে—

‘আমি তো নিশ্চয় আছি
সংঘ শুরু হলে বাঁচি!’

অন্য কোণে কার লেখা? নাম দেওয়া নেই, কিন্তু এ কালু না হয়ে যাবে না :

‘আমি তো ভাই,
মিলটিল রেখে পদ্য লিখতে চাই—
কিন্তু ছন্দ-টন্দ কিছু ঠিক থাকে না যে ছাই!
তা বলে দল থেকে আমাকে একেবারে বাদ দিয়ে দিবি কি তাই?’

আরেকটু হলেই হেসে ফেলেছিলাম। ও বাবা, মিস বিশ্বাস যে আমার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছেন। নিশ্চয় সন্দেহ করছেন— প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন নাকি? কী হবে, কিছুই তো শুনছিলাম না এতক্ষণ! বাঁচিয়ে দিল কালু। হাত তুলে সে নিজেই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। মিস বিশ্বাস তার দিকে তাকাতেই আমি চুপি চুপি লিখে ফেললাম—

‘ক্লাসের মাঝারে কবিতা রচনা
সুবিধা কি ভাই?
কোনদিন শেষে ধরা পড়ে যাব,
বকুনি খাব যে তবে!’

সন্তর্পণে লেখা কাগজটা আবার মালুর হাতেই ফেরত দিলাম। ঠিক তখনই ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা পড়ে গেল ঢং ঢং করে।

এইভাবে ক্লাসের মধ্যেই আমাদের নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘে জন্ম হয়েছিল।

কাজ শুরু করতে গিয়ে কিন্তু দেখা গেল মহা মুশকিল! অধিবেশন করার উপযুক্ত সময় পাওয়াই দায়!

গন্ডালু-দলের— মানে আমরা চার বন্ধু মালু, কালু, বুলু আর আমি (টুলু)— উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। কালুকে সভাপতি, বুলুকে তার সহকারী আর আমাকে কোশাধ্যক্ষ করে মালু নিজে হলো সংঘ সম্পাদিকা। গালভরা নাম সব! কিন্তু সভা কই যে তার আবার সভাপতি? বাইরে থেকে যে মেয়েরা আসে তারা তো ক্লাস শেষ হতে না হতেই বাড়ি চলে যায়। টিফিনের মাত্র আধ ঘণ্টা ছুটি, তখন টিফিন খাব, না কাব্যি করব? অবশেষে, বাইরের মেয়েরা ছেড়ে দিলো, কেবল বোর্ডাররাই মেম্বার হলো। ‘কোশে’ দু-দশ টাকা জমাও পড়ল। কিন্তু, সভা করব কখন?

মালু বলল, ‘সাহিত্যচর্চা তো আর দশ পনেরো মিনিটে হুড়মুড়িয়ে সারা যায় না— অন্তত ঘণ্টা দুই বসতে হবে সকলকে।’

বুলু বলল, ‘তবেই হয়েছে! সকালে পড়া, বিকেলে খেলা, সন্ধ্যায় আবার পড়া তারপরে খাওয়া আর ঘুম। দু-ঘণ্টা সময় একসঙ্গে ফাঁক পাবে কখন শুনি?’

আমি বলতে গিয়েছিলাম রবিবার দুপুরে— কিন্তু কথাটা শেষ না হতেই কাজল, ললিতা আর বিজলি আপত্তি করল ‘বারে, রবিবার তো বাড়ি যাই আমরা—’

মালু বলল, ‘তাহলে শনিবার বিকেলে—’

এবার আপত্তি তুলল বীণা, হাসি আর নন্দিতা, ‘আমাদের যে গানের ক্লাস থাকে শনিবার বিকেলে!’

কালু রেগে বলল ‘তবে ক্ষ্যান্ত দে ক্ষ্যান্ত দে! নাচ শিখবি, গান শিখবি, বাড়ি যাবি আবার কাব্যিও করবি— অত শত পারা যাবে না!’

কাজল আর বীণাও চটে গেল, 'তবে অমন সভা চাই না, আমাদের নাম কেটে দে!'

তাড়াতাড়ি মিটমাট করবার চেষ্টা করল মালু। 'মাথা গরম করিস্ না—থাম্—ভেবেচিন্তে সকলের সুবিধামতন সময় ঠিক করো।'

'ভেবে ভেবে তো হদ্দ হলাম'—বিরসবদনে গাল ফুলিয়ে উত্তর দিল বুলু।

পশ্চিমের ডর্মিটরিতে সন্ধেবেলা বসে কথা হচ্ছিল। কদিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলছে। মাঠে-ঘাটে-রাস্তায় প্যাচপ্যাচে কাদা, কদিন ধরে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ, খেলা বন্ধ, রোজ রোজ কেবল হল ঘরে ড্রিল হয়। সবাই অস্থির হয়ে উঠেছি—মন মেজাজ খারাপ—'কি করি-কি করি' ভাব সকলের —'একটা নতুন কিছু চাই!, একটা মজার কিছু চাই!'

'ইউরেকা!' চেঁচিয়ে উঠল কালু, 'আমাদের নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘের প্রথম অধিবেশন হোক রাত বারোটায়!'

'ও বাবা!' — 'রাত বারোটা?' —'কোথায়?' — 'কবে?' — 'কী করে হবে?' —তাকে সবাই আমরা প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুললাম।

'ঝড়-বাদলের দিনে তো আর বাইরে করা যাবে না,—আমার মনে হলো খাবার ঘরেই সবচেয়ে ভালো হবে।'

'ধরা পড়ব না তো?'

'অত রাতে তো আর ওখানে কেউ থাকবে না। খুব সাবধানে পা-টিপেটিপে যেতে হবে— যেন কাক -পক্ষীটিও টের না পায়!'

'যা ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিস—দুনিয়ার লোক তো এখনই সব জেনে গেল। দরজার বাইরে কে?'

'এই চুপ, চুপ—আস্তে কথা বল্—' সবাই উত্তেজনা সামলে নিল। বীণা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'ও কেউ না, কেষ্টদাসী মণিকাদিদের ঘর ঝাঁট দিতে এসেছে—'

এরপরে আমাদের ফিশফিশ করে পরিকল্পনা হলো। কদিন ধরে সব কিছু কেমন যেন নীরস মনে হচ্ছিল। কিন্তু সাহিত্য-সভার ব্যবস্থা হতেই যেন মন্ত্রবলে সকলের মন মেজাজ ভালো হয়ে গেল । একটা সাংঘাতিক গোপন উত্তেজনা, পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেই চোখ-টেপা আর চাপা হাসি। ক্লাসের পড়ায় অবশ্য সকলেই কেবল ভুল করতে লাগলাম আর বকুনিও খেলাম। কিন্তু কার সাধ্য যে আমাদের দমিয়ে দেয়।

বুলু দুই ক্লাসের ফাঁকে ফিশফিশ করে বলল, 'আমার কিন্তু ভাই বড্ড ভয় করছে! মণিকাদির যেন কেমন রাগ-রাগ ভাব! তবে কী —'

নিজের মনের ভয় চেপে রেখে তাকে সাহস দিলাম, 'ভাগ, ভীতু কোথাকার! পড়া না পারলে তো রাগ করবেনই। দেখিস, এর পরের দিন ভালো করে পড়া শিখে এসে কত খুশি করে দেবো।'

কালুর সব কাজই নিখুঁত। দুই ক্লাসের মধ্যে মধ্যে আমাদের কাছে ছোটো ছোটো একেকটা চিরকুট পাঠাতে লাগল — 'সম্পাদিকার রিপোর্ট তৈরি আছে তো মালু?' — 'বিস্কুট আনবার ভার তোর, মনে আছে হাসি?' — 'পেয়ারা, বিস্কুট আর চিনেবাদাম কিনবার পয়সা বুলু, হাসি আর কাজলকে দিয়ে দিস টুলু।'

নিদারুণ উত্তেজনার দিন যেন আর কাটতে চায় না! দুপুর আর বিকেল হয় না, বিকালের পর সন্ধে হবার নাম নেই, তারপর রাত কিছুতেই হতে চায় না!

শেষে রাত যদিও হলো, শোবার ঘণ্টাও পড়ল, ‘কিছুতেই ঘুমোব না’ পণ করে শুয়ে কখন যেন ঘুমিয়েও পড়লাম।

মাঝ রাতে কালুর সাংকেতিক শিস শুনে ঘুম ভেঙে গেল— থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম প্রথমে— কী হবে?— কী যেন হবে?— ঠিক ঠিক, আমাদের কবিতা সংঘে প্রথম অধিবেশন হবে। মনে পড়তেই চট করে পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেলাম। বুলুটাও অঘোরে ঘুমচ্ছে,— একধাক্কায় ওকে জাগিয়ে দিলাম। কোনোমতে জামাটা গায়ে দিলাম, চিরুনি খুঁজে পাচ্ছি না— যাকগে— মাঝরাতে কে আর আমাদের চুলের অবস্থা লক্ষ করতে যাচ্ছে! চুল না আঁচরেই তৈরি হয়ে নিলাম।

ততক্ষণে মালু আর কালু গিয়ে পূর্ব দিকে ডর্মিটরির মেয়েদেরও ডেকে নিয়ে এসেছে। খালি পায়ে অতি সাবধানে আমরা নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে চললাম। ‘কিচ’— সিঁড়ির দরজা সামান্য শব্দ করতেই কালুর চাপা ধমক— ‘আস্তে!’ কানে কানে বুলু বলল, ‘ও বাবা— ভয় করেছ!’

মাঝরাতে সব কিছুই অস্বাভাবিক লাগছে। তাদের যেন নিশ্বাসের ফোঁশফাঁশ, নড়াচড়ার খুসখাস আর কথা বলার ফিশফাশ! দূর— সব নিশ্চয় আমাদের কল্পনা— মাঝরাতে আর কে কোথায় থাকবে? চারদিকে নিস্তব্ধ, নিঝুম। কেবল দূরে একবার শেয়াল ডাকল।

মাঝরাতে ট্রেনটা চলে গেল। সকলের সামনে ছিল কালু। সাবধানে খাওয়ার ঘরের দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল— পিছন পিছন হুড়মুড়িয়ে ঢুকলাম আমরা সকলে— আর ঢুকেই হকচকিয়ে থমকে দাঁড়ালাম!

সেদিনের হতভম্ব ভাব কি জীবনে কোনোদিন ভুলব? এ কি সত্যি না স্বপ্ন? ঘটনা না কল্পনা? মস্ত বড়ো খাবার ঘরখানা আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল— ঠিক স্কুলের বার্ষিক উৎসবের সময় যেমন সাজানো হয়। মাঝের বড়ো টেবিলে শৌখিন সাদা ফুলকাটা চাদর পাতা ছিল। বড়ো বড়ো পিতলের ফুলদানিতে পদ্ম আর গোলাপ সাজানো ছিল। ভালো ভালো কাঁচের বাসনে অনেক খাবার সাজানো ছিল— আইসিং দেওয়া মস্ত বড়ো কেক, নানারকম সন্দেশ, আরো কী সব মিষ্টি, বড়ো বড়ো আপেল, মর্তমান কলা। টেবিলের চারদিকে চেয়ার সাজানো ছিল, তারই একদিকে তাঁরা বসেছিলেন সবাই।

ভালো করে চোখ রগড়ে আমরা আবার তাকিয়ে দেখলাম—হ্যাঁ তাঁরাই তো— মণিকাদি, অণিমাদি, হিরণদি, এমন কি মিস বিশ্বাস পর্যন্ত। তাঁদের পরনে দামি দামি সিল্কের জামাকাপড়—যেন নেমত্তন্ন বাড়িতে বা বড়ো কোনো উৎসবে এসেছেন। তাঁরা মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমাদের স্তম্ভিত অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছেন!

অণিমাদি ডেকে বললেন, ‘এসো—এসো—দাঁড়িয়ে

আছ কেন?' আমরা তো এক পাও নড়তে পারছি না।

ঘড়ি দেখে নিয়ে মণিকাদি কালুকে বললেন, 'সভার কাজ শুরু করে দাও সভানেত্রী।'

ও বাবা, ওঁরা দেখি সব খবরই রাখেন!

এর পরে আর দেরি করা চলে না, কোনোমতে বসে পড়লাম। বুলু ফিশফিশ করে বলল, 'আমার হাতে যে পেয়ারার থলি, কী হবে!'

আমি ততক্ষণে চিনেবাদামের ঠোঙা মাটিতে ফেলে দিয়েছি।

অণিমাদি আবার বললেন, 'মেয়েরা, খেতে শুরু করো।'

মণিকাদি বললেন 'সভা আরম্ভ হোক।'

এত ভালো ভালো খাবার, তাও যেন আমাদের গলা দিয়ে নামতে চায় না। আর এমন সপ্রতিভ ডানপিটে মেয়ে কালু, সেও অপ্রস্তুতভাবে কাঁপা-গলায় শুরু করল— 'ভদ্রমহিলা আর মহোদয়গণ!'

কে যেন ফিশফিশ করে বলল, 'মহোদয় কেরে?' দু-এক জনের চাপা-হাসি শোনা গেল। মণিকাদি প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের সব কাজ কি কবিতায় হবে?'

কালু আবার শুরু করল,

'ভদ্রমহিলা আর মহোদয়গণ,
আসিনি করিতে আমি মিঠে আলাপন।
অকবি কাজের কথা বলে নেব আগে,
কবির কবিতা যাতে বেশি মিঠে লাগে।
আজিকার আলোচনা পরীক্ষার বিষয়,
কবিরা এবার বলো যাহা মনে লয়।'

মণিকাদির হাততালির সঙ্গে আমরাও সকলে যোগ দিলাম।

হঠাৎ বুলুর হাতের পেয়ারার থলি কেটে গিয়ে ডজন খানেক ডাঁসা আর কাঁচা পেয়ারা মাটিতে ধপাধপ পড়ে চারিদিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, কিন্তু আমরা কিছুই শুনিনি-কিছুই জানি না মুখ করে রয়েছি। তারপর কাজলের পালা—

'দিদিমণি শোনো, ছাত্রীর আবদার শোনো,
পরীক্ষা পাশ করি যেন, আর মোর সাধ নেই কোনো।
আমরা চেঁচাব যত খুশি
ক্লাসে যদি না যাই, না যাব,
হেসে দেবো অকারণে হাসি,
কোনোদিন বই নাহি ছোঁব।
তবু যদি পরীক্ষা হয়,
পাশ করে দিও নিশ্চয়।'

আবার চটাপট হাততালির পালা। ততক্ষণে মেয়েদের উৎসাহ আর সাহস বেড়েছে। দুরু দুরু বক্ষে আমি শুরু করলাম এবার—

‘পরীক্ষা যদি কিছু না থাকিত আর,
সবগুলো বার যদি হতো রবিবার,
গল্পের বই যদি সব বই হতো,
হতেন খেলার সাথি শিক্ষিকা যত,
স্কুল বা কলেজ কিছু না থাকিত দেশে
তাহলে কী মজা হতো, ভাবি বসে বসে!’

বীণার কবিতার—দু-লাইন কেবল মনে আছে—

‘দয়া করে তুমি হে!
আমাকে পাশ করিও,
ভুল করে যদি ভুল লিখে ফেলি
নম্বর তবু দিও।’

বুলু কবির ওপর কেরদানি করে প্যারডি লিখেছিল—

‘রেখো গো আমারে মনে, এ মিনতি করি পদে।
পরীক্ষা করিতে পাশ
গলে যদি লাগে ফাঁস
ভুলিয়া যেও না মোরে স্ফীত হয়ে গর্বপদে!’...

সভার কাজ চলতে লাগল। প্রথমে ভয়ে ভয়ে শুরু করলেও, দিদিদের উৎসাহে সাহস পেয়ে একে একে সব কটি মেয়ে কবিতা পড়ে ফেলল। কবিতা পড়তে পড়তে কখন যে অতগুলো ভালো ভালো খাবার খেয়ে শেষ করে ফেললাম, নিজেরাই বুঝতে পারলাম না—মাঝরাতে যে অত খিদে পেতে পারে কে জানত!

প্রত্যেকটি মেয়ের নামে দু-দু-লাইন কবিতা সহ সম্পাদিকার রিপোর্ট দিয়ে শেষ হলো :

‘নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ নতুনই হয়েছে সৃষ্টি।
এর মধ্যেই করেছে সবার আকর্ষণ সে দৃষ্টি!
খুবই ভালো লোক যিনি প্রেসিডেন্ট, কাকলি চক্রবর্তী
মুখটি যেমন সদা হাসিমাখা, মনটিও স্নেহে ভরতি
সহকারী তাঁর বুলুবুলী সেন, বলব কি বেশি আর,
রূপে, গুণে, কাজে কোনো ত্রুটি নাই, মানুষ চমৎকার
ট্রেজারার যিনি লোক বড়ো ভালো, নাম তাঁর টুলু বোস।
রূপেও যেমন, কাজেও তেমন, নাই তাঁর কোনো দোষ।
মন্দ নেহাত নন সেক্রেটারি মালবি মজুমদার
(নিজমুখে নিজ গুণগান করা শোভা পায় না তাঁর)

মেম্বার যাঁরা আছেন তাঁদের একে একে দিই লিস্টি
মোটের ওপর সকলেই তাঁরা লোক অতিশয় মিষ্টি।'

সভানেত্রীর অনুমতি নিয়ে অণিমাদি উঠে দাঁড়িয়ে টিচারদের পক্ষ থেকে কবিতা সংঘকে অভিনন্দন জানালেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন মণিকাদি—ও বাবা, বকবেন নাকি? আমরা ভয়ে ভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

মণিকাদি শুধু বললেন—'আজকের সভা এখানেই শেষ হোক—যাও, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতন সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো দেখি।'

আর কি আমরা দাঁড়াই সেখানে?

এরপর কয়েকদিন আমাদের কী যে ভয়ে ভয়ে কাটল কী বলব! কীভাবে আমাদের গোপন সভার কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল সেটা আজ পর্যন্ত জানি না। হয়তো কেষ্টদাসী আড়ি পেতে শুনে দিদিদের বলে দিয়েছিল; কিংবা হয়তো অণিমাদি পাশের বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আমাদের কথা শুনে ফেলেছিলেন—প্রথমে আমরা যা চেঁচাচ্ছিলাম!

আমাদের বিস্কুট-পেয়ারা চিনেবাদামের কী গতি হয়েছিল তাও জানতে পারিনি। আমরা তো সেগুলি খাবার ঘরের মেঝেতেই ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম। আমাদের কি আর সে সব ভাববার অবসর ছিল? কখন টিচারদের ঘরে ডাক পড়বে, কত না জানি বকুনি খেতে হবে,—তার জন্যই আমরা দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিলাম। কী না জানি শাস্তি পাব সেই ভয়তেই আমরা তখন অস্থির!

টিচারদের ঘরে ডাক অবশ্য পড়ল। কিন্তু কী আশ্চর্য! শাস্তি দূরে থাক, বকুনিও খেলাম না। মাঝরাতের সভার নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করলেন না। কেবল আলোচনা হলো সাহিত্য সভার উপযুক্ত সময় কীভাবে পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক হলো যে এর পরের সপ্তাহ থেকেই সোম-মঙ্গল-বুধ এবং বৃহস্পতিবারে সকাল-সন্ধ্যা পড়ার ঘন্টা পনেরো মিনিট করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর তার পরিবর্তে শুক্রবার সন্ধেবেলা পড়ার ঘণ্টা থাকবে না, তখন মেয়েদের সাহিত্যসভা, গানের আসর বা অভিনয়-জাতীয় কোনো কিছু হবে।

আবার অণিমাদি আমাদের লেখাগুলির প্রশংসা করলেন, আমরা যেন লেখার অভ্যাস না ছাড়ি একথা বারবার বললেন।

মণিকাদি মন্তব্য করলেন, 'অবশ্য, সব সময়েই পরীক্ষা-বিরোধী কবিতা লিখো না।'

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ফিশফিশ করে কালু বলল, 'আমাদের দিদিদের মতন ভালো টিচার কি কোনো স্কুলে আছেন?'

উৎসাহ উজ্জ্বল মুখে মালু বলল, 'তাঁদের মুখ রাখতে হবে। সাহিত্য সভাকে ভালো করে গড়ে তুলতে হবে।'

সত্যিই আজকাল আমাদের সাহিত্য সংঘ যা জমজমাট হয়েছে কি বলব। সপ্তাহে সপ্তাহে অধিবেশন হয়, একটা হাতে লেখা পত্রিকাও বেরিয়েছে। ক্লাসের সব মেয়েরা যোগ দিয়েছে। সকলেরই লেখার আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে—তবে, বিশেষ করে গণ্ডালু দলের!

সবুজ জামা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গাছেরা কেমন সবুজ জামা পরে থাকে
আমাদের তোতাইবাবুরও একটি সবুজ জামা চাই।

চাই তো— কিন্তু তুই এখন অ-আ-ক-খ শিখবি।
ইস্কুলে যাবি।

গাছেরা এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে
তাদের জামা তুই গায়ে দিতে চাস কেন?

তোতাই অ-আ-ক-খ পড়বে না
ইস্কুলে যাবে না;
আর, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তো খেলা—
দাদু যেন কেমন, চশমা ছাড়া চোখে দেখে না।

তোতাইয়ের একটি সবুজ জামা চাই
তবেই না তার ডালে প্রজাপতি বসবে
আর টুপ করে তার কোলের ওপর নেমে আসবে
একটা, দুটো, তিনটে লাল-নীল ফুল

তার নিজের...

হাতে কলমে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০—১৯৮৫) **:** আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর রচিত অজস্র কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি, চারপাশের মানুষজন, নানান জীবন সংগ্রাম ও পরিস্থিতি রূপায়িত হয়েছে। *গ্রহচ্যুত, রাণুর জন্য, লখিন্দর, ভিসা অফিসের সামনে, মহাদেবের দুয়ার, মানুষের মুখ, ভিয়েতনাম : ভারতবর্ষ, আমার যজ্ঞের ঘোড়া : জানুয়ারি* ইত্যাদি তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। তিনি বহু কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করেছেন।

১.১ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ তোতাইবাবুর সবুজ জামা চাই কেন?

২.২ সবুজ গাছেরা কোন পতঙ্গ পছন্দ করে?

২.৩ সবুজ জামা আসলে কী?

২.৪ ‘এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তো খেলা’— এখানে কোন খেলার কথা বলা হয়েছে?

২.৫ তোতাই সবুজ জামা পরলে কী কী ঘটনা ঘটবে?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৩.১. ‘দাদু যেন কেমন, চশমা ছাড়া চোখে দেখে না।’— এই পঙ্‌ক্তির মধ্যে ‘যেন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেন? এই রকম আর কী কী শব্দ দিয়ে একই কাজ করা যায়?

৩.২. ‘সবুজ জামা’ কবিতায় তোতাইয়ের সবুজ জামা চাওয়ার মাধ্যমে কবি কী বলতে চাইছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

৪. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :**

৪.১. ‘ইস্কুল’ শব্দটির ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লেখো এবং একই রকম আরো দুটি শব্দ লেখো।

৪.২. ‘চোখ’ শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে অন্তত তিনটি বাক্য লেখো।

চিঠি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১২ রু-দ্য শ্যাঁতিয়ারস, ভার্সাই, ফ্রান্স
৩ নভেম্বর ১৮৬৪

প্রিয় বন্ধু,

আমার আগের একটি চিঠিতে আমি আপনাকে পরিষ্কার করেই হয়তো জানাতে পেরেছি, আমি একাকী লন্ডনে কেন যেতে চাই — একা যাওয়ার কারণ যখন জানিয়েছি তখন, আমার বিশ্বাস, আপনি আমার হয়ে আমাদের বিষয় আসয় তত্ত্বাবধান করবেন, যে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জলরাশি থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন আবার গিয়ে সেই বিপদে না পড়ি আপনি তা দেখবেন...।

শীতকাল এল বলে, এবার মারাত্মক শীত পড়বে বলে মনে হচ্ছে। ইউরোপের শীতকাল সম্বন্ধে আপনি কোনো ধারণা করতে পারবেন না। এখনও শরৎকাল আছে, তবু আমার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়েছে; আর, গায়ে এমন জামাজোব্বা পরে আছি যা নাকি আমাদের দেশে ছোটোখাটো একটা মোট বিশেষ। আমাদের দেশের সবচেয়ে ঠান্ডার মাসের সবচেয়ে ঠান্ডার দিনের চেয়েও এখানে প্রায় ছয় গুণ বেশি ঠান্ডা! আপনার কি ভারতচন্দ্রের সেই লাইনটা মনে আছে?

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী

তিনি যদি এদেশে থাকতেন শীত সম্বন্ধে কী লিখতেন?

হে প্রিয় বন্ধু, আপনি মনে করবেন না যে, আমি এখানে অলসভাবে দিন কাটাচ্ছি। আমি ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান প্রায় রপ্ত করে ফেলেছি, এখন মনোনিবেশ করে জার্মানি ভাষা চর্চা করছি — এবং এসব মাইনে করা কোনো শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই। জার্মান হচ্ছে অদ্ভুত ভাষা। আপনি জানেন, আমিও অকপটেই বলি এর বর্ণমালা রোমান নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর নয়, পরে হবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার (পরে মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত) বীরসিংহ গ্রামে এঁর জন্ম। এঁর তুল্য পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক খুব কমই আছেন। দুইটি চতুর্দশপদী কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি মধুসূদন তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মধুসূদনের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ এইটেই প্রমাণ করে যে, মধুসূদনের প্রতিভা ঈশ্বরচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, তিনি স্বয়ং প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই আর-এক প্রতিভাকে এত কাছে থেকেও ধরতে পারেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লোকান্তরিত হন।

প্রিয় গৌর,

হে আমার প্রিয় ও পুরাতন বন্ধু, আমি 'সীলোন' নামক জাহাজে চলেছি, এখন তোমাকে কয়েক লাইন লিখবার জন্যে বসেছি। জাহাজটা হচ্ছে রূপকথার রাজ্যের ভাসমান একটি প্রাসাদ-বিশেষ, বুঝলে বৎস! এই জাহাজে সব ব্যাপারেই এমন অপূর্ব জাঁকজমকের ব্যবস্থা আছে বা নাকি তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। এর সেলুনগুলো এমন যা রাজপ্রাসাদেই মানায়, ক্যাবিনগুলো রাজকুমারদেরই উপযোগী। কিন্তু সেসব কথা ক্রমশ পরে বলা যাবে — আমি ইংলন্ডে পৌঁছোবার পর এই সমুদ্রযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ দেবার জন্যে যখন সময় ও অবসর পাব, তখন। ঠিক এই সময়ে আমি ভেসে চলেছি বিখ্যাত সেই ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে, উত্তর-আফ্রিকার পর্বতাকীর্ণ উপকূল দেখা যাচ্ছে। গতকাল আমরা মলটায় ছিলাম, গত রবিবারে আলেকজান্দ্রিয়ায়। আর কয়েক দিনের মধ্যেই, আশা করছি, ইংলন্ডে পৌঁছে যাব। ঠিক ২২ দিন আগে আমি কলকাতায় ছিলাম! বেশ দ্রুতগতিতেই কি আমরা চলছি না? কিন্তু এই ভ্রমণের একটা বিষণ্ণ ব্যাপারও আছে। সব জানতে পারবে, ধৈর্য ধরো বন্ধু, ধারণ করো ধৈর্য। 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এর জন্যে এই ভ্রমণের একটা সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত বিবরণ লেখার ইচ্ছে আছে, এবং তার সম্পাদককে সেই পত্রিকার একটি কপি তোমাকে পাঠাতে বলারও বাসনা আছে, অবশ্য তুমি যদি তার গ্রাহক না-থেকে থাক। এখন কী নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছ, হে বন্ধু! আমার মনে হচ্ছে এই জাহাজে আমার দেশের আধা-ডজন খানেক লোক যদি থাকত, তাহলে নিজেদের নিয়েই একটা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারতাম। আমাদের হরি এখন কোথায় তা তোমার কি জানা আছে? যদি জান, তাহলে আমার কথা তাকে মনে করে দিয়ো। ইংলন্ডে গিয়ে আমি চিঠি না-দেওয়া পর্যন্ত এ চিঠির উত্তর দিয়ো না। সেখানে পৌঁছেই আমি তোমাকে আমার ঠিকানা জানাব; তখন তুমি তোমার প্রাণ উজাড় করে আমাকে অনবরত পত্রাঘাত করতে পারবে; যদিও আমার মনে হচ্ছে যে আমি তখন আমার বন্ধুদের জন্যে বেশি সময় খরচ করতে পারব না, কেননা, আমি জীবিকানির্বাহের জন্যে যে পেশা শিখতে এসেছি তাতে মনোনিবেশ করব বলে এবং সম্মান অর্জন করব বলে দৃঢ়সংকল্প।

স্পেনের উপকূল ছাড়িয়ে, রবিবার

এই দুই দিন চিঠিটা ফেলে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ এটা শেষ করবই। আগামীকাল সকালে আমরা জিব্রলটারে পৌঁছোতে পারি, সেখানেই চিঠিটা ডাকে দেবো। তুমি ধারণা করতে পারবে না সমুদ্র আজ কতটা শান্ত; এটা, বিশ্বাস করো, আমাদের হুগলি নদীটির মতো। এখানকার আবহাওয়া আমাদের দেশের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মতো,ত খুব গরমও না, খুব ঠান্ডাও না। আমি ভেবেছিলাম খুবই বুঝি ঠান্ডা হবে জায়গাটা। কিন্তু সকলে বলছে, আমরা আটলান্টিকে ও বিস্‌কে উপসাগরে ঢুকলে সব অন্য প্রকার হবে। কোনো খবর? তোমাকে দেবার মতো এখন কিছু নেই, লন্ডনে পৌঁছে অনেক খবর দিয়ে তোমার আশ মেটাব। তুমি ঠিক জেনো, এমনকি আমার শিশুকাল থেকে আমি যে-দেশ সম্বন্ধে এমনভাবে চিন্তা করে এসেছি আমি প্রতিটি মিনিটে তার নিকটবর্তী হয়ে চলেছি, এ কথা যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে কল্পিত কাহিনি থেকেও বিচিত্র। এবার তাড়াতাড়ি শেষ করি, কিন্তু তার আগে জানিয়ে রাখি তোমার অকৃত্রিম ও আন্তরিক ও চির স্নেহমুগ্ধ —

গৌরদাস বসাক : মাইকেল মধুসূদনের বাল্যসুহৃদ। হিন্দু কলেজের সহাধ্যায়ী। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বড়োবাজারের বিখ্যাত বসাক-পরিবারে গৌরদাসের জন্ম। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে এগারো বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু-কলেজে ভর্তি হন। এর বছর তিন পরে, ১৮৪০ সনে, মধুসূদনের সংস্পর্শে তিনি আসেন, অচিরেই তা নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আনুমানিক ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে বৃত হন। অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গৌরদাসের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সেকালের রঙ্গালয়-আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। মধুসূদনের প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ ছিল, এবং মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে এতটাই শ্রদ্ধা তাঁর ছিল যে, তিনি তাঁর এই বন্ধুটির জীবনী রচনার জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর প্রায় ২৭ বছর পরে ইনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

প্রিয় রাজনারায়ণ,

ইতিমধ্যে তুমি তোমার পূরাতন ডেরায় পৌঁছে গিয়ে থাকবে। তোমাকে অনুনয় জানাচ্ছি, মেঘনাদ সম্বন্ধে আমাকে লেখো। তোমার রায় জানবার জন্য আমি রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করছি।

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি, এবং ছয়-সাত দিন শয্যাগত থাকি। মেঘনাদ আমাকে শেষ করবে অথবা আমি মেঘনাদকে শেষ করব — সে সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়ার উপক্রম হয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি জয়ী হয়েছি। মেঘনাদ মারা গিয়েছে, অর্থাৎ আমি ষষ্ঠ সর্গ শেষ করেছি প্রায় ৭৫০ লাইনে। তাকে মেরে ফেলতে আমাকে অনেক অশ্রুপাত করতে হয়েছে। যাই হোক, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত খাড়া করার সুযোগ পাবে।

এই কাব্য অদ্ভুতরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কেউ-কেউ বলছেন এটি মিলটনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর — কিন্তু ওসব বাজে কথা — মিলটনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হতে পারে না কোনোকিছুই। অনেকে বলছেন এটি কালিদাসের কাছাকাছি, এ কথায় আমার কোনো আপত্তি নেই। ভার্জিল কালিদাস বা তাসো'র সমতুল্য হওয়া আমি অসম্ভব বলে মনে করি নে। তাঁরা যদিও কীর্তিমান, তবুও তাঁরা নশ্বর পৃথিবীর কবি; কিন্তু মিলটন স্বর্গীয়।

তোমার যা মনে হয়েছে তুমি তা লিখে জানাবেই। এ রকম হাজার-হাজার মানুষের জয়ধ্বনির চেয়ে তোমার অভিমত অনেক নির্ভরযোগ্য।

এ রকম শুনছি যে, অনেক হিন্দু মহিলা বইটি পড়ছেন, পড়ে ক্রন্দন করছেন। তোমার স্ত্রী যাতে কাব্যটি পড়েন তোমার সে ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাকে চিঠি লিখো, এবং এক মুহূর্তের জন্যেও এ বিশ্বাস হারিয়ো না যে আমি অকপট ও আন্তরিকভাবে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুরাগী।

পাঠ্য তিনটি চিঠির তরজমা করেছেন সুশীল রায়

রাজনারায়ণ বসু : ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দক্ষিণে অবস্থিত বোড়াল গ্রামে জন্ম। শৈশবকাল থেকেই ইনি বিদ্যানুরাগী। ষোলো বছর বয়সে ইনি হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গৃহে মুনশির নিকট পারস্যভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পরে, ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর গবর্নমেন্ট স্কুলে হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। ইনি মধুসূদনের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। উভয়ের প্রতি উভয়ের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং এই ধর্ম প্রচারের জন্য অনেক উদ্যোগ করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে দেওঘরে ইনি লোকান্তরিত হন।

হাতে কলমে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। বাল্যবয়সেই কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ। বিলেত যাওয়ার জন্য তিনি ধর্মান্তরিত হন। গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও বাংলা ভাষায় পরবর্তীকালে দক্ষতা লাভ করেন। *রত্নাবলী*, *শর্মিষ্ঠা*, *একেই কি বলে সভ্যতা*, *পদ্মাবতী* ইত্যাদি নাটক এবং *মেঘনাদবধ কাব্য*, *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*, *চতুর্দশপদী কবিতা* ইত্যাদি তাঁর অসামান্য সৃষ্টি। *পদ্মাবতী* নাটকে তিনি প্রথম *অমিত্রাক্ষর ছন্দ* ব্যবহার করেন।

১.১ মধুসূদন দত্ত কোন কলেজের ছাত্র ছিলেন?

১.২ পদ্মাবতী নাটকে তিনি কোন ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর ‘প্রিয় ও পুরাতন বন্ধু’ গৌরদাস বসাককে কোথা থেকে পাঠ্য চিঠিটি লিখেছিলেন? তাঁর যাত্রাপথের বিবরণ পত্রটিতে কীভাবে ধরা পড়েছে আলোচনা করো।

২.২ মধুসূদনের জীবনের উচ্চাশার স্বপ্ন কীভাবে পত্রটিতে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে?

২.৩ বিদেশে পাড়ি জমানোর সময়েও তাঁর নিজের দেশের কথা কীভাবে পত্রলেখকের মনে এসেছে?

২.৪ ‘... একথা যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।’ — কোন কথা? সে-কথাকে বক্তার অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে কেন?

২.৫ প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে হৃদ্যতার ছবি পত্রটিতে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করো।

২.৬ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রে লেখক তাঁর এই প্রিয় বন্ধুটির কাছে কোন আবেদন জানিয়েছেন?

২.৭ ‘এই কাব্য অদ্ভুতরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।’ — কোন কাব্যের কথা বলা হয়েছে? সে কাব্যের জনপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে লেখক কোন কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন?

২.৮ প্রিয় বন্ধুর প্রতি, সর্বোপরি সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের যে পরিচয় রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রটিতে পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করো।

২.৯ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ৩ নভেম্বর ১৮৬৪খ্রিস্টাব্দে লেখা মধুসূদনের চিঠিটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২.১০ বিদ্যাসাগরকে লেখা পত্রটিতে মধুসূদনের জীবনে তাঁর ভূমিকার যে আভাস মেলে, তা বিশদভাবে আলোচনা করো।

আলাপ

পূর্ণেন্দু পত্রী

বাইরে ঘোর কুয়াশা। ভিতরে উদ্বিগ্ন যাত্রীদের ভিড়। স্থান —পালাম বিমানবন্দর। তারিখ, ২১ ডিসেম্বর। সময় সকাল সাড়ে ছয়। একটু আগে মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত প্লেনগুলি ছাড়ছে না। কখন ছাড়বে, তা নির্ভর করছে সূর্যদেবের কিরণ অথবা করুণার উপর। সিকিউরিটির এলাকা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতেই চোখ আটকে গেল কফি কর্নারের গায়ে। দুই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি কফির পেয়ালা হাতে আলাপরত। দুজনেই কলকাতার যাত্রী। একজন কলকাতা ফিরছেন রাজস্থান থেকে নিজের পরবর্তী ছবির লোকেশন দেখে। আরেকজন আসছেন কলকাতায় ওস্তাদ আলি খাঁ সঙ্গীত সম্মেলনে, ঐ দিনেরই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। একজন ৪০১ প্লেনের যাত্রী। অপরজন ৪০১/এ-র। দীর্ঘ পনেরো বছর পরে মুখোমুখি দেখা দুজনের। দুজনেই খুব খুশি।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কানে এল দুই শিল্পীর কথোপকথন। যিনি রাজস্থান থেকে ফিরছেন তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আপনারা বাইরে গিয়ে যখন বাজান, তখন কি আলাপের অংশটাকে একটু ছেঁটে ছোটো করে দেন? কালো ওভারকোটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চকচকে চৌকো একটা বাকসো। ডালা খুলে তুলে নিলেন একটা বিড়ি। অল্প একটু-খানি ধোঁয়া ছেড়ে স্মিত প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা বাড়িয়ে নিয়ে উত্তর দিলেন যিনি, তিনি কলকাতায় আসছেন সেতার বাজাতে। — না, না, একেবারেই নয়। বিশেষ করে ধরুন জার্মানি বা ফ্রান্সে, আপনি শুনলে অবাক হবেন, একঘণ্টা পনেরো থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত আলাপ করেছি। করেছি মানে বুঝতে পারছি, এই আলাপ আরো কুড়ি মিনিট বাড়িয়ে দিলেও, দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবে। তা ছাড়া আজকাল বিদেশি শ্রোতারা অনেক বেশি সচেতন। কোন রাগ কেমন, তাল, বোল, মীড়ের কাজ এ সব বেশ ভালোই বোঝে। ধরুন, ইউনিভারসিটির ছাত্ররা একঘণ্টার একটা লেকচারে ডাকল। কী রকম সব প্রশ্ন করে জানেন।

একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, আচ্ছা এই যে বাজাতে বাজাতে 'ইমপ্রোভাইজ' করেন, এটা কী করে সম্ভব? কী রকম জটিল প্রশ্ন ভেবে দেখুন।

আলাপ গড়াতে গড়াতে চলে গেল রাজস্থানে। কথা উঠল ওখানকার ফোক টিউন, ফোক ইনসট্রুমেন্ট নিয়ে। দু-জনেই একমত যে ওখানকার প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষও এক একজন ওস্তাদ বাজিয়ে। এবং এমন সব সাধারণ বাজনা ওখানে ঘরে ঘরে বাজে, যার গভীরতা ভোলা যায় না?

পাশ থেকে জনৈক দিল্লিপ্রবাসী বাঙালি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, খাঁ সাহেব, আপনি দিল্লিতে বাজান না কেন? আবার মুখে সেই প্রসন্ন হাসি। কিন্তু পান-চিবানো ঠোঁটের ফাঁকে এবং প্রশস্ত কপালে একটুখানি যেন বিদ্রুপের ছায়া।

—বাজাই না, কারণ বাজনা শোনার সমঝদার লোকের অভাব, তাই। দিল্লি থেকে মাঝে মাঝে ডাক যে আসে না তা নয়। সাড়া জাগে না মনে। কিন্তু কলকাতা থেকে ডাক এলেই যে ছুটে যাই, তার কারণ, কলকাতার মানুষ গান বাজনার সত্যিকারের সমঝদার। অনেকরকম রাজনীতির ঝড়, গণ্ডগোল, ঘটে গেছে তবু কলকাতার মানুষ গান-বাজনাকে ভালোবাসতে ভোলেনি। একবার কী হয়েছিল বলি। মোরাদাবাদের একজন নামজাদা শিল্পী, তবলায় খুব গুণী আর্টিস্ট, কলকাতায় এসেছেন। ঘরোয়া একটা অনুষ্ঠান ডেকেছি। হাজার খানেক টাকাও তুলেছি দু-চার টাকার টিকিট বেচে। অনুষ্ঠানের দিন সেই শিল্পী হঠাৎ মন্তব্য করে বসলেন, কলকাতার আদমিরা বে-রস। গান-বাজনার তালিম পাওয়া লোকজন সংখ্যায় বড়ো কম। কথাটা বুকে বাজল। আমার একটা বদ অভ্যাস আছে। আমি গ্রিনরুমে কথা বলি না। স্টেজে বলি। সেদিন করলাম কী, অনুষ্ঠানের আগে স্টেজে উঠে সেই শিল্পীকে বললাম, আসুন আপনার সঙ্গে কলকাতার কিছু 'ছোটোখাটো' আর্টিস্টদের আলাপ করিয়ে দি। এরা সব খুবই 'ক্ষুদ্র শিল্পী।' এই বলে জ্ঞানবাবুকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে স্টেজে বসিয়ে দিয়ে বললুম, বাজান তো ঘোষ সাহেব। তরপর ঘোষ সাহেবের আধঘণ্টার বাজনা শুনে, সেই শিল্পী তো লজ্জায় লাল। কফি কর্নার থেকে হাত সাতেক দূরে বাকসো বন্দি হয়ে পড়ে আছে একটা লম্বা সেতার। কফি পান শেষ। দুই শিল্পী ঘুরে তাকালেন বিমানবন্দরের দিকে। তখনো কুয়াশা কাটেনি। গান থেকে আলোচনা ফিরে এল যানবাহনের সমস্যায়। যিনি রাজস্থান থেকে ফিরছেন তিনি বললেন, এরকম কিছুদিন চললে, সব তো থেমে যাবে। এই জের টেনে, যিনি সেতারী, বললেন, আর বলেন কেন। দেরাদুন থেকে দিল্লি এলাম, পেট্রোল খরচ পড়ল আগের চেয়ে চার গুণ বেশি। হঠাৎ রোদের ঝলকে ধূসর বিমানবন্দর রুপোলি হয়ে উঠল। দুই শিল্পী ঘুরে তাকালেন সেই রোদের দিকে।

যাক, রোদ উঠল তাহলে। ওঁরা দু-জন এগিয়ে গেলেন নিজেদের বিশ্রামের আসনের দিকে। মাইক কথা বলে উঠল। হ্যাঁ, প্লেন ছাড়বে। তবে বেশ বিলম্বে।

বিমানবন্দরে অপেক্ষমান এই দুই যাত্রীর একজন সত্যজিৎ রায়, আরেকজন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ।

পরবাসী

বিষ্ণু দে

দুই দিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ
এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে-তালে।
রাতের আলোয় থেকে-থেকে জ্বলে চোখ,
নেচে লাফ দেয় কচি-কচি খরগোশ।

নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি
হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কত্থক,
তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে
মিলিয়েছি তার সুষমা।

চুপি-চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়!
শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ-আহ্বান।
চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে
বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে।

কোথায় সে বন, বসতিও কৈ বসেনি,
শুধু প্রান্তর শুকনো হাওয়ার হাহাকার।
জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?
সারাদেশময় তাঁবু ব'য়ে কত ঘুরব?
পরবাসী কবে নিজবাসভূমি গড়বে?

হাতে কলমে

বিষ্ণু দে (১৯০৯—১৯৮২) : আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবি কলকাতার বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উর্বশী ও আর্টেমিস* ১৯৩২ খিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে — *চোরাবালি, পূর্বলেখ, সন্দ্বীপের চর, অন্বিষ্ট, নাম রেখেছি কোমলগান্ধার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ, সেই অন্ধকার চাই,* উত্তরে *থাকো মৌন* প্রভৃতি। *রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সাহিত্যের দেশ বিদেশ, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা* তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। তিনি অজস্র বিদেশি কবিতার অনুবাদ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে *এলিঅটের কবিতা, হে বিদেশী ফুল, আফ্রিকায় এশিয়ায় মুরলী মৃদঙ্গ তূর্যে* প্রভৃতি গ্রন্থ।

১.১ কবি বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা দুটি প্রবন্ধের বইয়ের নাম লেখো।

২. **নিম্নরেখ শব্দগুলির বদলে অন্য শব্দ বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো। প্রথমটি করে দেওয়া হলো :**

২.১ দুই দিকে বন, মাঝে <u>ঝিকিমিকি</u> পথ

দুই দিকে বন, মাঝে আলোছায়া পথ

২.২ এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির <u>তালে তালে</u>।

২.৩ তাঁবুর ছায়ায় নদীর <u>সোনালি সেতারে</u>

২.৪ হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের <u>কত্থক</u>,

২.৫ বন্য প্রাণের <u>কথাকলি</u> বেগ জাগিয়ে।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ পথ কীসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে?

৩.২ চিতার চলে যাওয়ার ছন্দটি কেমন?

৩.৩ ময়ূর কীভাবে মারা গেছে?

৩.৪ প্রান্তরে কার হাহাকার শোনা যাচ্ছে?

৩.৫ পলাশের ঝোপে কবি কী দেখেছেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো :**

৪.১ জঙ্গলের কোন কোন প্রাণীর কথা কবি এই কবিতায় বলেছেন?

৪.২ সেতারের বিশেষণ হিসেবে কবি 'সোনালি' শব্দের ব্যবহার করেছেন কেন?

৪.৩ কত্থক ও কথাকলি-র কথা কবিতার মধ্যে কোন প্রসঙ্গে এসেছে?

৪.৪ ‘সিন্ধুমুনির হরিণ-আহ্বান’ কবি কীভাবে শুনেছেন?

৪.৫ ‘ময়ূর মরেছে পণ্যে’ এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ কী?

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৫.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহারের দিক থেকে কবিতাটির শেষ স্তবকের বিশিষ্টতা কোথায়? এর থেকে কবি-মানসিকতার কী পরিচয় পাওয়া যায়?

৫.২ কবি নিজেকে পরবাসী বলেছেন কেন?

৫.৩ ‘জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের/পত্তন নেই...’ — প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই পঙ্‌ক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করো।

৫.৪ ‘পরবাসী’ কবিতার প্রথম তিনটি স্তবক ও শেষ দুটি স্তবকের মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের কোনো পার্থক্য থাকলে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৫.৫ ‘পরবাসী’ কবিতাতে কবির ভাবনা কেমন করে এগিয়েছে তা কবিতার গঠন আলোচনা করে বোঝাও।

৫.৬ কবিতাটির নাম ‘পরবাসী’ দেওয়ার ক্ষেত্রে কবির কী কী চিন্তা কাজ করেছে বলে তোমার মনে হয়? তুমি কবিতাটির বিকল্প নাম দাও এবং সে নামকরণের ক্ষেত্রে তোমার যুক্তি সাজাও।

শব্দার্থ : কথাকলি — কেরলের ধ্রুপদি নৃত্যশৈলী। নিটোল — সুগোল। কত্থক — জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ঘরানার নৃত্যশৈলী। সুষমা — শোভা, সৌন্দর্য। লুব্ধ — লোলুপ, লোভী।

৬. টীকা লেখো :

কত্থক, সেতার, কথাকলি, সিন্ধুমুনি, পণ্য

৭. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

জ্বলে, পরবাসী, চলে, তাঁবু

৮. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো :

নিটোল, বনময়ূর, সিন্ধুমুনি, নিজবাসভূমি, সেতার

৯. নীচের শব্দগুলি কীভাবে গঠিত হয়েছে দেখাও :

সোনালি, আহ্বান, বন্য, বসতি, পরবাসী

১০. নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :

১০.১ চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়। (সরল বাক্যে)

১০.২ নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি। (জটিল বাক্যে)

১০.৩ চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে। (যৌগিক বাক্যে)

১০.৪ কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়? (না-সূচক বাক্যে)

১১. যে-কোনো দুটি স্তবকের মধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ-এর ব্যবহার কবি কীভাবে করেছেন, দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

পথচল্‌তি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্যাপারটা খুব সম্ভবত ১৯২৮ সালে শীতকালে ঘটেছিল— বছর আর তারিখটা ঠিক-মতন মনে পড়ছে না। শ্বশুরালয় গয়া থেকে ফিরছি। দেহরা-দুন এক্সপ্রেস ধরব। সঙ্গে একখানি মধ্যম শ্রেণির রিটার্ন টিকিটের ফিরতি অংশ আছে।

ইস্টিশানে পৌঁছে দেখলুম, ট্রেন যথাকালে এল, কিন্তু কেন জানি না, গাড়িতে সেদিন অসম্ভব ভিড় দেখলুম। মধ্যম শ্রেণির কোনো কামরায় তো ঢুকতেই পারা যায় না, দ্বিতীয় শ্রেণির গাড়িগুলিতেও লোকে মেঝেতে বিছানা করে নিয়ে, কোথাও বা বসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ট্রেনটা একবার ঘুরে দেখবার মতলবে ইঞ্জিনের দিকে চলেছি, এমন সময় দেখি, একটা বড়ো তৃতীয় শ্রেণির 'বগি'র কাছে একেবারেই লোকের ভিড় নেই। গিয়ে দেখি, এই বিরাট গাড়িখানি গুটিকতক কাবুলিওয়ালার দখলে। কেউ সেখানে গেলে, বা জানালা দিয়ে উঁকি মারলে, হুংকার ছাড়ছে—'ইয়ে গাড়ে তোমারা ওয়াস্তে নেহি—জো তুম উদর।' জবরদস্ত চেহারার কাবুলিওয়ালারা এই হুংকার দ্বারা লোক ঠেকিয়ে রাখছে। রেলের কর্মচারী বা পুলিশ এর ত্রি-সীমানাতেও ঘেঁষছে না।

তখন ঠিক করলুম, এই গাড়িতেই ঢুকব, আর ওখানেই জায়গা করে নেব। আমার সাহস হচ্ছে খালি এইজন্য যে, আমি দু-চারটি ফারসি কথা বলতে পারি। ফারসি হচ্ছে আফগানিস্তানের শিক্ষিতজনের ভাষা, উচ্চ ও ভদ্রসমাজের ভাষা, সরকারি ভাষা। অন্তত তখন তা-ই ছিল। কাবুলিওয়ালা পাঠানদের মাতৃভাষা পশতুর সম্মান তখন ছিল না। একে তো পশতুভাষী লোকেদের মধ্যে শিক্ষা আর সংস্কৃতির অভাব, আর তার উপরে তাদের ভাষায় সাহিত্যও তেমন নেই। আমার মনে হলো, এদের মধ্যে ফারসি বলাটা যখন একটা শিক্ষা আর আভিজাত্যের লক্ষণ, তখন আমি যদি এদের সঙ্গে ফারসিতে দুই-একটা কথা বলি, তাহলে এরা প্রথমত একটু হকচকিয়ে যাবে, বাঙালিবাবুর মুখে ফারসি শুনে, আর তারপরে তারা হয়তো আমার জন্য জায়গাও করে দিতে পারে। জবরদস্ত আর মারমুখী হলেও আমি জানি যে এই পাঠানদের মধ্যে আবার একটু শিশুসুলভ ভাবও আছে।

সোজা গিয়ে গাড়ির হাতল ধরে—দরজাটা আধখোলা ছিল—আরো টেনে খুলে, ভিতরে ঢুকতে যাব, এমন সময় পাঁচ-ছয়জন গুরুগম্ভীর স্বরে হুংকার দিয়ে উঠল—'কিদর আতে হো? ইয়ে গাড়ে তুম লোগ কে ওয়াস্তে নেহি, সির্ফ হম পঠান-লোগ ইসমেঁ জাতে হৈঁ।' আমি এর জবাব দিলুম ফারসিতে—'ম-রা জগহ্ বি-দেহ্, বরারে সির্ফ য়ক আদমি।' অর্থাৎ, আমাকে জায়গা দাও, খালি একজন মানুষের জন্য। যা অনুমান করেছিলুম—ওরা একটু যেন হতভম্ব হয়ে গেল। একজন আমার কথা বুঝতে না পেরে বললে—'ক্যা মাঙ্গতা?' আমি আবার ফারসিতে বললুম—'ফারসি ন-মী-দানি? ফারসি ন-মী-গোয়ি?' অর্থাৎ, ফারসি জানো না? ফারসি বলতে পারো না? খুব সম্ভব এদের মধ্যে ফারসি-জানা লোক ছিল না। তখন আমি নিজের গলাটা চড়িয়ে একটু উপহাসের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললুম—'অজ চি তর্ফ-ই-অফঘানিস্তান মী-আদমি, কি দর-জবান-ই-ফারসি গুফৎ-গু কর্দনে, তাকৎ-ই-শুমা নীস্ত?' —আফগানিস্তানের কোন অঞ্চল থেকে আসছ যে ফারসিতে কথা বলবার ক্ষমতা তোমাদের নেই? যখন তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, তখন গাড়ির ভিতর থেকে একটি ছোকরা বললে—'ম্যান ফওরসি মী-দওনম; চি খাহি?' অর্থাৎ আমি ফারসি জানি—কী চাও? আমি উত্তর দিলুম—'মন

গুফ্‌তা বুদম্—ম-রা জগহ্ বি-দেহ্।' —আমি তো বললুম, আমাকে জায়গা দাও। তখন সে জিজ্ঞাসা করলে—'কুজা মী-রভী?' —অর্থাৎ কোথায় যাবে? জবাব দিলুম—'দর শহর কলকত্তা বি-রভম।' —কলকাতা শহরে যাব।

তখন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ইশারায় দলের অনুমতি পেয়ে, ফারসি-বলিয়ে ছোকরাটি বললে— '—ব্যালে, অ্যান্দর বি-অও'—আচ্ছা, ভিতরে এসো। আমি ভিতরে ঢুকতেই, সেই বিরাট 'বগি'র একটা পুরো বেঞ্চি এরা খালি করে আমাকে ছেড়ে দিলে। তার সঙ্গে একটুখানি সমীহ করার ভাবও ছিল, যেন এক মস্ত আলেম এসেছেন। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

কিন্তু গুরুবলে রক্ষা পেলুম; বুঝতে পারা গেল, এরা সবাই হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ আর Pathan Tribal Area অর্থাৎ ইংরেজদের অধীনস্থ পাঠান উপজাতি অঞ্চলের লোক, খাস কাবুলির মতন সাধারণত এরা ফারসি জানে না। এটা আমার পক্ষে ভারি সুবিধার আর স্বস্তির কথা হলো, কারণ ওদের সঙ্গে বাকি যা আলাপ হলো, প্রায় সবই হিন্দুস্থানিতে, আর বাংলায়। দুই-একজন মাঝে-মাঝে এক-আধ লবজ ফারসি বললে বটে, কিন্তু এদের বিদ্যেও বেশি দূর এগোল না।

ট্রেন চলছে। চারদিকে বেশ করে তাকিয়ে নিলুম, প্রায় ষোলোজন পাঠান মর্দ এই গাড়ির যাত্রী। সমস্ত গাড়িখানা বাসি কাপড়-চোপড়, দেহের ঘর্ম আর তার সঙ্গে হিং-এর উগ্র গন্ধে ভরপুর। এই অপূর্ব সৌরভের সংমিশ্রণ—কড়াভাবে আমার নাসারন্ধ্রকে আক্রমণ করলে।

একটুখানি দূরে, উপরের বাংকের উপরে শয়ান একটি বৃদ্ধ পাঠান, আমাকে ঢুকতে দেখে, শোয়া অবস্থা থেকে উঠে খাটন-মালা হয়ে আসন নিয়ে বসেছিল—টঙের উপর থেকে আমাকে নিবিষ্টচিত্তে দেখে একটুখানি

পরে জিজ্ঞাসা করলে—'বাবু, বাংলাদেশের থুন নি আইছ—তুমি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছ?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'আগা-সাহেব, তোমার ব্যবসা কোথায়? বাংলাদেশে তোমার ডেরা কোথায়?' বৃদ্ধ পাঠানটি বললে—'পড়ুয়াহালি। বাবু, দান নি বালো অইছে—ধান ভালো হয়েছে কি?' বুঝলুম, আগা-সাহেবের ব্যবসা হচ্ছে শীতবস্ত্র আর হিং বিক্রি করা, আর চাষিদের টাকা ধার দেওয়া। বাংলার পল্লি অঞ্চলে, বরিশালের পটুয়াখালি বন্দরে তাঁর কেন্দ্র। পরে তাঁর সঙ্গে কথা বললুম—দেখলুম, তিনি বরিশাইল্যা ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মতনই বলতে পারেন, কলকাতার ভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়নি। একজন পাঠান একটু আরতি করে আমায় বললে—'বাবু, তুম ডরো মৎ, অগর কোই পুছেগা কি তুম বাঙ্গালি পাঠানোঁকি গাড়ি মেঁ বরকে কাহে সৈর করতে হো, তো হম লোগ বোলেগা, উও হমারা বাবু হৈ, হমারা হিসাব লিখতা হৈ।' তার দরদ দেখে খুশি হলুম—যাতে আমি সগৌরবে এদের সঙ্গে চলতে পারি, এদেরই যেন একজন হয়ে, সেইটি তাদের ইচ্ছে।—আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার 'কাবুলি ব্যাংক'-এর হিসাবনবিশ কেরানি বা ম্যানেজারের মর্যাদা দিলে।

আমি বললুম—'তোমরা কেউ খুশ-হাল খাঁ খট্টকের গজল জানো?' খুশ-হাল খাঁ খট্টক হচ্ছেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ের মানুষ, পাঠানদের পশতু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাতে একটি পাঠান, যে উপরের বাংকে বসে ছিল, ভারি খুশি হলো, আর উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বললে—'খুশ-হাল খাঁ খট্টকের গজল শুনবে? বাবু, দেখছি তুমি আমাদের সব খবর-ই জানো, আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।' এই বলে সে পাঠান কবি খুশ-হাল খাঁ খট্টকের পশতু ভাষায় রচিত গজল ধরলে। ভাবের আতিশয্যের সঙ্গে, কখনো-কখনো কানে হাত দিয়ে, কখনও বুকে হাত দিয়ে, গানের কলি গাইতে লাগলেন। তারপর, ঢাকের বাদ্যি থামলেই যেমন মিষ্টি লাগে, তাঁর গান থামল।

আমি তখন অতি সহজ আর সরল ভাবে বিষয়ান্তরের অবতারণা করলুম—'বহুৎ খুব, বাহবা বেশ; ধন্যবাদ। পশতু গজল তো শোনালে; এখন আদম খান আর দুরখানির মহব্বতের কিসসা কেউ জানো?' তাতে পাঠানদের একজনের খুব উৎসাহ হলো। বললে—'কী বলছ বাবু, আদম খাঁ দুরখানির কিসসা শুনবে? এ তো দিল-ভাঙা কাহিনি। আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।' এই না বলে সে আবার তার কর্কশ যদিও গুরুগম্ভীর কণ্ঠে এই কিসসা, কতকটা গান করে আর কতকটা পাঠ করে যেতে লাগল।

এইভাবে আমরা দেহরা-দুন এক্সপ্রেসের সেই থার্ড ক্লাস গাড়িখানিতে যেন এক পশতু-সাহিত্য-গোষ্ঠী বা সম্মেলন লাগিয়ে দিলুম।

আমার সামনের বেঞ্চিতে দুই পাঠান সহযাত্রী নিজেদের ভাষায় আমার সম্বন্ধে আলোচনা করছে, শুনলুম। পশতু ভাষা বুঝি না, কিন্তু এই ভাষায় প্রচুর ফারসি আর আরবি শব্দ আছে, কাজেই উর্দুটা একটু জানা থাকলে অনেক শব্দ বুঝতে পারা যায়, আর তার সাহায্যে, কী বিষয়ে আলাপ হচ্ছে সেটা বুঝতে দেরি হয় না। এরা ভারি বিদ্বান আর বুদ্ধিমান; দেখছ না, ইংরেজদের লেখা সব বই পড়ে আর ফারসি পড়ে, এই বাবু আমাদের সম্বন্ধে কত খবর জানে, মায় আমাদের খাস দেহাতি কথাও কত জেনে নিয়েছে।

পাঠান দেশে পাঠানদের মধ্যে একটি বাঙালি ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার কথা কোনো বাংলা মাসিক পত্রে — বোধহয় 'প্রবর্তক' পত্রিকায় অনেকদিন আগে পড়েছিলুম, সে-কথা মনে হচ্ছে।

পাঠানদের প্রায় প্রত্যেকেই ক্রমে এক-একটি বেঞ্চ বা বার্থ দখল করে শোবার চেষ্টা করলে। তখন রোজার সময়। সকলেই আগে সান্ধ্য আহার সেরে নিয়েছিল। এই রাত্রে আমারও বেশ ভালো ঘুম হলো। এদের সঙ্গে থেকে, গাড়ির ভিতরকার সৌরভে আমার নাসিকাটিও ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার পরের দিন খুব ভোরেই উঠে দেখি, এদের মধ্যে কেউ-কেউ উঠে নমাজ পড়ছে, আর সারাদিন রোজার উপোস করতে হবে বলে খুব ভোরে ভরপেট খেয়ে নিচ্ছে—বড়ো-বড়ো পাঠান 'রোটা' আর কাবাব। পটুয়াখালির বৃদ্ধ আগা-সাহেবকে দেখি, অনেক আগেই উঠে বসে তসবিহ বা মালা জপ করছেন—'নব্বদ্-ও-নও অসমা-ই-হাসানা' অর্থাৎ আরবি ভাষায় ঈশ্বরের নিরানব্বুইটি পবিত্র ও সুন্দর নাম, মালার এক-একটি দানা গুনে-গুনে আবৃত্তি করা হয় নীরবে। আমার ঘুম ভাঙতে আর তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, তিনি আমাকে 'সুখসৌপ্তিক' প্রশ্ন শুধালেন, —'বাবু, কাইল রাইতে একটু কাইত হইবার পারছিলা?' অর্থাৎ কাল রাত্রে একটু কাত হতে বা নিদ্রা দিতে পেরেছিলে? এই প্রশ্নটি যে স্বাভাবিক ভদ্রতাপ্রণোদিত সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ি বোধহয় আসানসোলে এসে পড়েছে।

এইভাবে যথাকালে কলকাতাতে এসে পৌঁছলুম। গাড়ির ভিড়ের কথা চিন্তা করলে বলতে হবে, বেশ ভালোই এলুম, আর ক্ষণিকের সহযাত্রী ভিন্নজাতির বন্ধু কতকগুলির সঙ্গ-সুখও লাভ হলো। তাদের কারো সঙ্গে আর ভবিষ্যতে কখনও দেখা হবে না,—অন্তত বোধহয় এভাবে নয়—কিন্তু এই রাতটির কথা খুব ভালোভাবেই আমার মনে আছে।

হাতে কলমে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) **:** ভাষাতাত্ত্বিক, বহুভাষাবিদ এই লেখক অধ্যাপকের জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। তিনি *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থের রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে — *দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ*, *ইউরোপ ভ্রমণ*, *সাংস্কৃতিকী* প্রভৃতি। তাঁর আত্মজীবনী *জীবনকথা* একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ।

১.১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর নাম কী?

১.২ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

২.১ লেখকের কোন ট্রেন ধরার কথা ছিল?

২.২ একটা তৃতীয় শ্রেণির বগির কাছে একেবারেই লোকের ভিড় নেই কেন?

২.৩ পাঠানদের মাতৃভাষা কী?

২.৪ বৃদ্ধ পাঠানের ডেরা বাংলাদেশের কোথায় ছিল?

২.৫ খুশ-হাল খাঁ খট্টক কে ছিলেন?

২.৬ আদম খাঁ ও দুরখানির কিসসার কাহিনি কেমন?

২.৭ এই পাঠ্যে কোন বাংলা মাসিকপত্রের উল্লেখ আছে?

২.৮ রোজার উপোসের আগে কাবুলিওয়ালারা ভরপেট কী খেয়েছিলেন?

২.৯ ‘তসবিহ’ শব্দের অর্থ কী?

২.১০ আরবি ভাষায় ঈশ্বরের নিরানব্বইটি পবিত্র ও সুন্দর নামকে কী বলা হয়?

৩. **নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

হুংকার, স্বস্তি, বিষয়ান্তর।

৪. **নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করো:**

ফিরতি, আভিজাত্য, জবরদস্ত, নিবিষ্ট, উৎসাহিত।

৫. **ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো :**

শীতবস্ত্র, মাতৃভাষা, শিশুসুলভ, ত্রিসীমানা।

৬. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো:

৬.১ গাড়িতে সেদিন অসম্ভব ভিড় দেখা গেল। (না-সূচক বাক্যে)

৬.২ কাবুলিওয়ালা পাঠানদের মাতৃভাষা পশতুর সম্মান তখন ছিল না। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৬.৩ কলকাতার ভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়নি। (জটিল বাক্যে)

৬.৪ দুই-একজন মাঝে-মাঝে এক-আধ লবজ ফারসি বললে বটে, কিন্তু এদের বিদ্যেও বেশিদূর এগোল না। (সরল বাক্যে)

৬.৫ বাংলাদেশে তোমার ডেরা কোথায়? (নির্দেশক বাক্যে)

৭. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে টীকা লেখো:

কাবুলিওয়ালা, পশতু, ফারসি, আফগানিস্থান, বরিশাল, গজল, উর্দু, নমাজ।

শব্দার্থ : আলেম — সর্বজ্ঞ। সুখসৌপ্তিক — আরামের ঘুম সম্বন্ধীয়।

৮. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো :

৮.১ স্টেশনে পৌঁছে লেখক কী দেখেছিলেন?

৮.২ দু-চারটি ফারসি কথা বলতে পারার ক্ষমতা লেখককে কী রকম সাহস দিয়েছিল?

৮.৩ 'আলেম' শব্দের মানে কী? লেখককে কারা, কেন 'এক মস্ত আলেম' ভেবেছিলেন?

৮.৪ আগা-সাহেব সম্বন্ধে যা জানা গেল, সংক্ষেপে লেখো।

৮.৫ লেখকের সামনের বেঞ্চির দুই পাঠান সহযাত্রী নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা করছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখো। লেখক কীভাবে সেই কথার অর্থ বুঝতে পারলেন?

৯. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৯.১ পাঠ্য গদ্যটির ভাবের সঙ্গে 'পথচল্‌তি' - নামটি কতখানি সংগতিপূর্ণ হয়েছে, বিচার করো।

৯.২ পাঠ্য গদ্যাংশটি থেকে কথকের চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যগুলি তোমার চোখে ধরা পড়েছে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে লেখো।

৯.৩ কথকের সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের প্রারম্ভিক কথোপকথনটি সংক্ষেপে বিবৃত করো।

৯.৪ কথক কেন বলেছেন — 'যেন এক পশতু-সাহিত্য-গোষ্ঠী বা সম্মেলন লাগিয়ে দিলুম।'— সেই সাহিত্য সম্মেলনের বর্ণনা দাও।

৯.৫ 'পথচল্‌তি' রচনায় ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যে সহজ বন্ধুত্ব ও উদার সমানুভূতির ছবিটি পাওয়া যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। বর্তমান সময়ে এই বন্ধুত্ব ও সমানুভূতির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিয়ে দাও।

১০. রেলভ্রমণের সময় অচেনা মানুষের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি রম্যরচনা লেখো। তোমার লেখাটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি আঁকো।

একটি চড়ুই পাখি

তারাপদ রায়

চতুর চড়ুই এক ঘুরে ফিরে আমার ঘরেই
বাসা বাঁধে। অন্ধকার ঠোঁটে নিয়ে সন্ধ্যা ফেরে যেই
সে'ও ফেরে; এ বাড়ির খড় কুটো, ও বাড়ির ধান
ছড়ায় শব্দের টুকরো, ঘর জুড়ে কিচিমিচি গান।
কখনো সে কাছাকাছি কৌতূহলী দুই চোখ মেলে
অবাক দৃষ্টিতে দেখে—হয়তো ভাবে লোকটা চলে গেলে
এই ঘর জানলা দোর, টেবিলে ফুলদানি, বই-খাতা
এ সব আমার-ই হবে; আমাকেই দেবেন বিধাতা।

আবার কার্নিশে বসে চাহনিতে তাচ্ছিল্য মজার,
ভাবটা যেন—এই বাজে ঘরে আছি নিতান্ত মায়ার
শরীর আমার তাই। ইচ্ছে হলে আজই যেতে পারি
এপাড়ায়-ওপাড়ায় পালেদের বোসেদের বাড়ি।
তবুও যায় না চলে এতটুকু দয়া করে পাখি
রাত্রির নির্জন ঘরে আমি আর চড়ুই একাকী।

হাতে কলমে

তারাপদ রায় (১৯৩৬ - ২০০৭) : বিশিষ্ট কবি ও রসরচনাকার। কথ্যভঙ্গি ও পরিহাস মিশ্রিত কাব্যভাষায় তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *তোমার প্রতিমা, নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক, কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু, দারিদ্র্যরেখা, জলের মতো কবিতা।* বাংলা শিশুসাহিত্যের পরিচিত চরিত্র *ডোডো ও তাতাই* তাঁরই সৃষ্টি।

১.১ তারাপদ রায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

২.১ কবিতায় চড়ুই পাখিটিকে কোথায় বাসা বাঁধতে দেখা যায়?

২.২ চড়ুই পাখি এখান-সেখান থেকে কী সংগ্রহ করে আনে?

২.৩ কবির ঘরে কোন কোন জিনিস চড়ুই পাখিটির চোখে পড়ে?

২.৪ ইচ্ছে হলেই চড়ুই-পাখি কোথায় চলে যেতে পারে?

৩ **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৩.১ ‘চতুর চড়ুই এক ঘুরে ফিরে আমার ঘরেই বাসা বাঁধে।’ — চড়ুই পাখিকে এখানে ‘চতুর’ বলা হলো কেন?

৩.২ কবিতায় বিধৃত চিত্রকল্পগুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৩.৩ ‘হয়তো ভাবে ...’ —চড়ুই পাখি কী ভাবে বলে কবি মনে করেন?

৩.৪ ‘আবার কার্নিশে বসে চাহনিতে তাচ্ছিল্য মজার, ...’ — তাচ্ছিল্যভরা মজার চাহনিতে তাকিয়ে চড়ুই কী ভাবে?

৩.৫ ‘চড়ুই পাখিকে কেন্দ্র করে কবির ভাবনা কীভাবে আবর্তিত হয়েছে, তা কবিতা অনুসরণে আলোচনা করো।

৩.৬ ‘তবুও যায় না চলে এতটুকু দয়া করে পাখি’ — পঙ্ক্তিটিতে কবিমানসিকতার কীরূপ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?

৩.৭ ছোট্ট চড়ুই পাখির জীবনবৃত্ত কীভাবে কবিতার ক্ষুদ্র পরিসরে আঁকা হয়েছে তার পরিচয় দাও।

৩.৮ ‘কৌতূহলী দুই চোখ মেলে অবাক দৃষ্টিতে দেখে’ — চড়ুইপাখির চোখ ‘কৌতূহলী’ কেন? তার চোখে কবির সংসারের কোন চালচিত্র ধরা পড়ে?

৩.৯ ‘রাত্রির নির্জন ঘরে আমি আর চড়ুই একাকী।’ — পঙ্‌ক্তিটিতে ‘একাকী’ শব্দটি প্রয়োগের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৩.১০ ‘একটি চড়ুই পাখি’ ছাড়া কবিতাটির অন্য কোনো নামকরণ করো। কেন তুমি এমন নাম দিতে চাও, তা বুঝিয়ে লেখো।

শব্দার্থ: কার্নিশ — ছাদ বা দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশ। চাহনি — নজর / দৃষ্টিপাত। তাচ্ছিল্য — অবজ্ঞা/অবহেলা।

৪ নীচের শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করো :

সন্ধ্যা, কৌতূহলী, দৃষ্টি

৫. নীচের বাক্যগুলির ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো :

৫.১ চতুর চড়ুই এক ঘুরে ফিরে আমার ঘরেই বাসা বাঁধে।

৫.২ বই-খাতা এসব আমার-ই হবে।

৫.৩ আবার কার্নিশে বসে।

৫.৪ এই বাজে ঘরে আছি।

৫.৫ ইচ্ছে হলে আজই যেতে পারি।

৬. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

৬.১ অন্ধকার ঠোঁটে নিয়ে সন্ধ্যা ফেরে যেই সে’ও ফেরে। (সরল বাক্যে)

৬.২ কখনো সে কাছাকাছি <u>কৌতূহলী</u> দুই চোখ মেলে অবাক দৃষ্টিতে দেখে। (নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দের বিশেষ্যের রূপ লিখে বাক্যটি আবার লেখো।)

৬.৩ আমাকেই দেবেন বিধাতা। (না-সূচক বাক্যে)

৬.৪ এই বাজে ঘরে আছি নিতান্ত মায়ার শরীর আমার তাই। (জটিল বাক্যে)

৬.৫ ইচ্ছে হলে আজই যেতে পারি এ পাড়ায় ও পাড়ায় পালেদের বোসেদের বাড়ি। (জটিল বাক্যে)

৭. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

চড়ুই, ধান, চোখ, জানলা, দোর, ইচ্ছে, পাখি

৮. ‘চোখ’ শব্দটিকে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করো।

দাঁড়াও

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

হাতেকলমে

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—১৯৯৫) : বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। জন্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ু গ্রামে। পড়াশুনো করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য*। এছাড়াও *ধর্মে আছি জিরাফেও আছি*, *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান*, *সোনার মাছি খুন করেছি*, *যেতে পারি কিন্তু কেন যাব* উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। *কুয়োতলা*, *অবনী বাড়ি আছো?* তাঁর লেখা বিখ্যাত দুটি উপন্যাস। তিনি *আনন্দ* পুরস্কার এবং *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পেয়েছেন।

১.১ শক্তি চট্টোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

১.২ তাঁর লেখা একটি উপন্যাসের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ 'মতো' শব্দ ব্যবহার করা হয় কখন? তোমার যুক্তির পক্ষে দুটি উদাহারণ দাও।

২.২ কবি পাখির মতো পাশে দাঁড়াতে বলছেন কেন?

২.৩ 'মানুষই ফাঁদ পাতছে' — কবি এ কথা কেন বলেছেন? 'মানুষ' শব্দের সঙ্গে 'ই' ধ্বনি যোগ করেছেন কেন— তোমার কী মনে হয়?

২.৪ 'তোমার মতো মনে পড়ছে' — এই পঙ্‌ক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ কী?

২.৫ 'এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও' — এই পঙ্‌ক্তিটির বিশেষত্ব কোথায়? এই ধরনের দুটি বাক্য তুমি তৈরি করো।

৩. 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' — কী কারণে কবি এই কথা বলেছেন?

৪. 'মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও'— এই পঙ্‌ক্তিটিকে তিনবার ব্যবহার করার কারণ কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

৫. কবিতাটির নাম 'দাঁড়াও' কতটা সার্থক? কবিতাটির নাম 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' হতে পারে কি— তোমার উত্তরের ক্ষেত্রে যুক্তি দাও।

৬. কবি কাকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে অনুরোধ করছেন বলে তোমার মনে হয়?

৭. কবিতাটি চলিত বাংলায় লেখা, শুধু একটা শব্দ সাধু ভাষার। শব্দটি খুঁজে বার করো এবং শব্দটিকে এভাবে ব্যবহার করেছেন কেন কবি?

৮. প্রথম স্তবকের তিনটি পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটির দলসংখ্যা কত? প্রতিটি পঙ্‌ক্তি কটি রুদ্ধদল ও মুক্তদল নিয়ে তৈরি?

৯. **কী ঘটেছে লেখো :**

সন্ধ্যা > সন্ধে

ফাদ > ফাঁদ

পল্লীসমাজ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

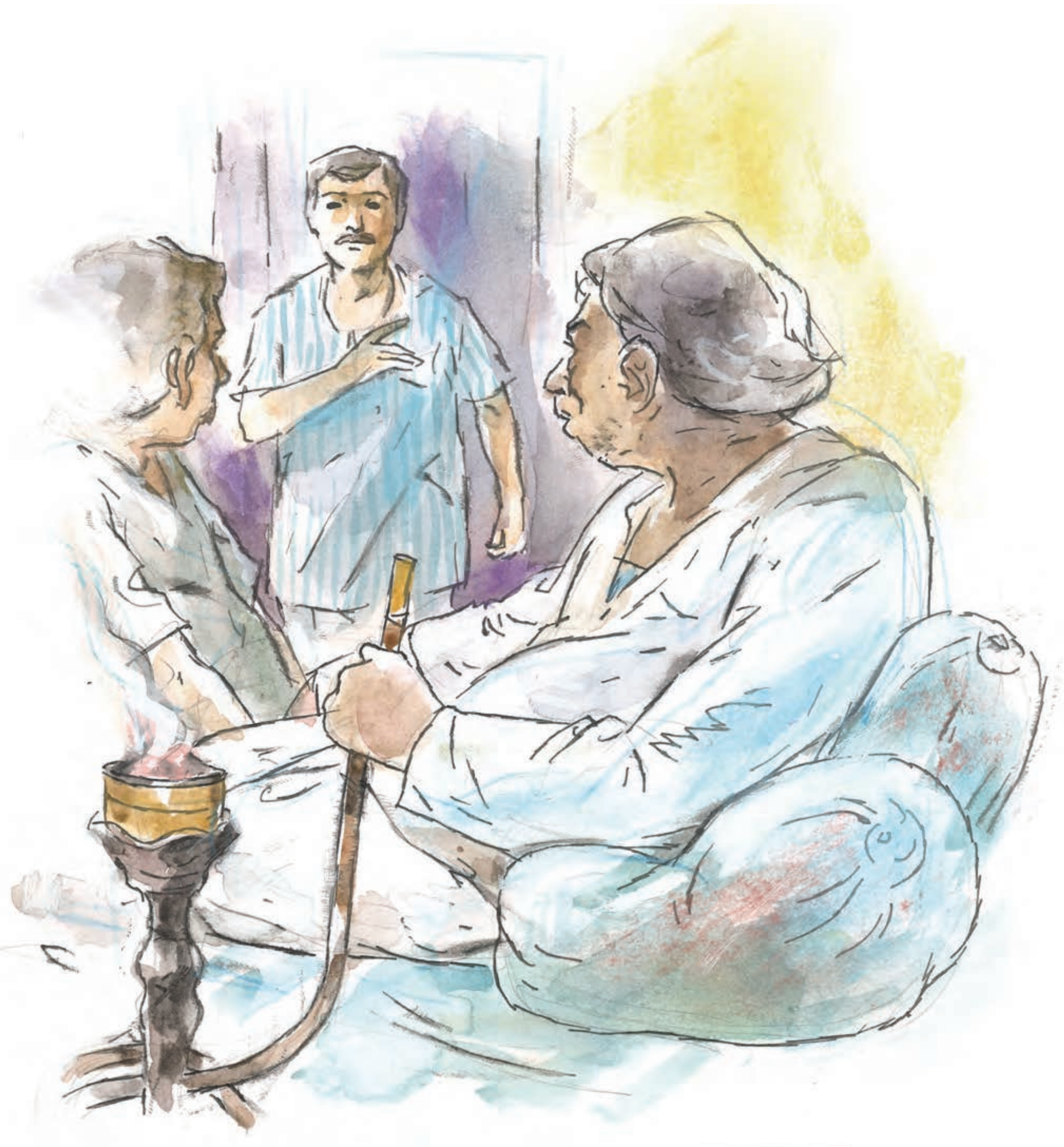

দুইদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্ণবেলায় একটু ধরন করিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডীপে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ জমিদারির হিসাবপত্র দেখিতেছিল; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—ছোটোবাবু, এ যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।

রমেশ অবাক হইয়া কহিল, ব্যাপার কী?

চাষিরা কহিল, একশো বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।

কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই একটা প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। একশো বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষিদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্বধারে সরকারি প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম ও উত্তর ধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণ ধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এই দিক দিয়া জল-নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মতো আছে। বৎসরে দুশো টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষিরা আজ সকাল হইতে তাঁহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।

রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুত পদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছে এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন; বোধ করি এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে তো আর চলবে না, এখনি সেটা কাটিয়া দিতে হবে।

বেণী হুঁকাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কোন বাঁধটা?

রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল, জলার বাঁধ আর কটা আছে বড়দা? না কাটলে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বার করে দেবার হুকুম দিন।

বেণী কহিল, সেই সঙ্গে দু-তিনশো টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি? এ টাকাটা দেবে কে? চাষারা, না তুমি?

রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল, চাষারা গরিব, তারা দিতে তো পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেবো সে তো বুঝতে পারিনে!

বেণী জবাব দিল, তা হলে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব সে তো আমি বুঝতে পারিনে!

হালদারের দিকে চাহিয়া বলিল, খুড়ো এমনি করে ভায়া আমার জমিদারি রাখবেন! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকান্না কাঁদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দারোয়ান নেই? তার পায়ের নাগরাজুতো নেই? যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করোগে; জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে। বলিয়া বেণী হালদারের সঙ্গে একযোগে হিঃ হিঃ করিয়া নিজের রসিকতায় নিজে হাসিতে লাগিল।

রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিল,

ভেবে দেখুন বড়দা আমাদের তিন ঘরের দুশো টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরিবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।

বেণী হাতটা উলটাইয়া বলিল, হলো হলোই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সদরটা কোপালেও তো দুটো পয়সা বার হবে না যে ও-শালাদের জন্যে দু-দুশো টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, এরা সারা বছর খাবে কী?

যেন ভারি হাসির কথা! বেণী একবার এপাশ একবার ওপাশ হেলিয়া দুলিয়া মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া থুথু ফেলিয়া শেষে স্থির হইয়া কহিল, খাবে কী? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠান্ডা করে চলো, কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধটুকরো উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়েচেড়ে গুছিয়ে গাছিয়ে খেয়েদেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে! ওরা খাবে কী? ধার-কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটোলোক বলেচে কেন?

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত রাখিয়াই বলিল- আপনি যখন কিছুই করবেন না বলে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চললুম তার মত হলে আপনার একার অমতে কিছু হবে না।

বেণীর মুখ গম্ভীর হইল; বলিল বেশ, গিয়ে দেখো গে তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় ভায়া, তাকে ভোলানো সহজ নয়। আর তুমি তো ছেলেমানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে নাকের জলে করে তবে ছেড়েছিল। কি বলো খুড়ো?

খুড়োর মতামতের জন্য রমেশের কৌতূহল ছিল না। বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহায় প্রবৃত্তি হইল না; নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠিক সুমুখে রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথায় আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসির সেই প্রথম দিনের নিষেধবাক্য

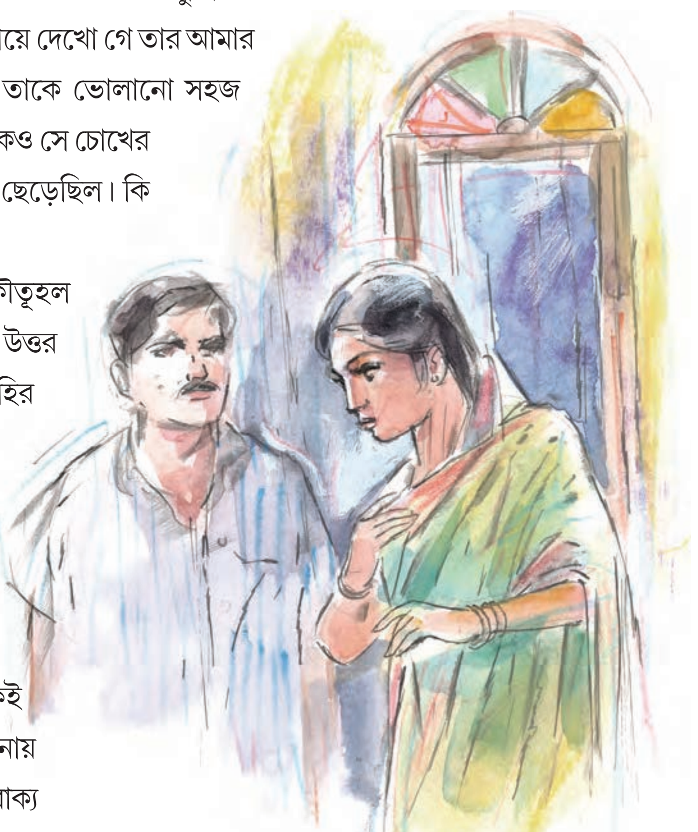

রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদাবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। দু-জনের মাসখানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেছ। জল বার করে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেছি।

রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল; সে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল, সে কেমন করে হবে? তা ছাড়া বড়দার মত নেই।

নেই জানি। তাঁর একলার অমতে কিছুই আসে যায় না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, জল বার করে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু মাছ আটকে রাখার কী বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ কহিল, অত জলে কোনো বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছরে সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশ কহিল, তাহলে অনুমতি দিলে?

রমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।

রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই। বরং কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অনুরোধ রমা কিছুতেই প্রত্যাখান করিতে পারিবে না।

রমা মুখ তুলিয়াই বোধ করি রমেশের অবস্থাটা অনুভব করিল। কহিল তা ছাড়া, বিষয় আমার ভাইয়ের, আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ কহিল না, অর্ধেক তোমার।

রমা বলিল, শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে; তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

তথাপি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল, রমা এ কটা টাকা? তোমার অবস্থা এ দিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালো। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি করে জানাচ্চি রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট করে দিয়ো না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা তেমনি মৃদুভাবেই জবাব দিল, নিজের ক্ষতি করতে পারিনি বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভালো, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না।

তাহার মৃদুস্বরে বিদ্রুপ কল্পনা করিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমারও আজ তাই পেল। কিন্তু তোমাকে আমি এমন করে ভাবিনি! চিরকাল ভেবেচি তুমি এর চেয়ে অনেক উঁচুতে কিন্তু তুমি তা নও! তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল, তুমি নীচ, অতি ছোটো।

অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কি আমি?

রমেশ কহিল, তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেননি; পুরুষমানুষ হয়ে তাঁর

মুখে যা বেধেচে, স্ত্রী লোক হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি—কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সবচেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেচ।

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ তেমনি শান্ত তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কী করব, তাও এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনই জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেবো - তোমরা পারো আটকাবার চেষ্টা করো গে। বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা কহিল আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে, কিন্তু এ কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না।

রমেশ প্রশ্ন করিল, কেন?

রমা কহিল, কারণ এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

তাহার মুখে যে কীরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোঁট কাঁপিয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও রমেশ লক্ষ করিতে পারিল। কিন্তু মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, একটু ভাবলেই তা টের পাবে। কিন্তু তোমার সদ্ভাবের মূল্যেও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই। যাই হোক, বাগ্‌বিতণ্ডার আবশ্যক নেই, আমি চললুম।

মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ-সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, রমা দাসিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এই জলকাদায় সন্ধ্যার পর কোথায় যাস রমা?

একবার বড়দার ওখানে যাব মাসি। দাসি কহিল পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। ছোটোবাবু এমনি রাস্তা বাঁধিয়ে দিয়েছেন যে সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরিব-দুঃখী সাপের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেচে।

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা গলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে —পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙা, কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা গলায় অনুনয় করিতেছেন, কথা শোন আকবর, থানায় চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি তো ঘোষাল-বংশের ছেলে আমি নই। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা তুমি একবার বলো না, চুপ করে রইলে কেন?

কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মতো নীরবে বসিয়া রহিল।

আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, সাবাস! হাঁ—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটোবাবু! লাঠি ধরলে বটে!

বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই তো বলচি আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার হিন্দুস্থানি চাকরটার?

আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল, সেই বেঁটে হিন্দুস্থানিটার সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়োবাবু? কি বলিস রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?

আকবরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই বাপ্ করে বসে পড়ল বড়োবাবু!

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা; সাবেক দিনের লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্যে পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভালো করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানিটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কী করে। সে নিজেই যে এতবড়ো লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তখন ছোটোবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাক্‌রান, তিন বাপব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মতো তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও তো জমিজমা আছে, সমঝে দেখ রে সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?

মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটোবাবু তুমি একটিবার পথ ছাড়া তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে ক সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ কোদাল মারচে, ওদের মুন্ডু কটা ফাঁক করে দিয়ে যাই!

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটারা —তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে—

তাহারা তিন বাপবেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়োবাবু বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি — ও পারি না।

কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, কারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়োবাবু, চোখে দেখলি জানতি পারতে ছোটোবাবু কী!

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটোবাবু কী! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটোবাবু চরাও হয়ে তোকে মেরেচে!

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল, তোবা তোবা দিনকে রাত করতি বলো বড়োবাবু?

বেণী কহিল নাহয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেন্ট বার করে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভালো করে আর একবার বুঝিয়ে বলো না। এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাকরান ও পারব না।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল, কী কও বড়োবাবু সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কয় না? দিদিঠাকরান তুমি হুকুম করলে আসামি হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, ফৈরিদি হবো কোন কালামুয়ে?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল, পারবে না আকবর?

আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাকরান আর সব পারি সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে পারি না। ওঠ রে গহর এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না। বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অনুনয়, বিনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল এবং আজিকার এত বড়ো অপমান ও তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়েও কেন যে কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বুকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল; ইহার কোনো হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং যতই মনে হইতে লাগিল সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কী করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়া ছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

হাতে কলমে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) **:** রবীন্দ্র সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বর্ণময় জীবনের অধিকারী। তাঁর লেখায় জীবনের সেই অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। বাংলার গ্রাম-জীবন এবং মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা তাঁর গল্প উপন্যাসে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় ভাষারূপ পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *বড়দিদি, পল্লীসমাজ, দেবদাস, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, শেষ প্রশ্ন* প্রভৃতি। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে *লালু, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ* ইত্যাদি পাঠক মহলে আজও সমাদৃত। পাঠ্য রচনাটি তাঁর *পল্লীসমাজ* উপন্যাসের অংশ বিশেষ।

১.১ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

১.২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটি ছোটো গল্পের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির দু-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

২.১ গোপাল সরকারের কাছে বসে রমেশ কী করছিল?

২.২ গ্রামের একমাত্র ভরসা কী ছিল?

২.৩ ‘বোধ করি এই কথাই হইতেছিল’— কোন কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

২.৪ রমা আকবরকে কোথায় পাহারা দেবার জন্য পাঠিয়েছিল?

২.৫ ‘পারবি নে কেন?’ — উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোন কাজটি করতে পারবে না?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৩.১ কুড়িজন কৃষক রমেশের কাছে এসে কেঁদে পড়ল কেন?

৩.২ রমেশ বেণীর কাছে জল বার করে দেবার হুকুম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল কেন?

৩.৩ বেণী জল বার করতে চায়নি কেন?

৩.৪ ‘ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল’ — রমেশের এমন অবস্থা হয়েছিল কেন?

৩.৫ ‘রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল’ — রমেশের বিস্ময়ের কারণ কী ছিল?

৩.৬ রমা রমেশের অনুরোধে রাজি হয়নি কেন?

৩.৭ ‘মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে’ — কে, কার সম্পর্কে একথা বলেছিল? সে কেন একথা বলেছিল?

৩.৮ ‘রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল’ — রমার এমন অবস্থা হয়েছিল কেন?

৩.৯ রমা আকবরকে ডেকে এনেছিল কেন?

৩.১০ ‘মোরা নালিশ করতি পারব না’ — কে একথা বলেছে? সে নালিশ করতে পারবে না কেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ ‘ নইলে আর ব্যাটাদের ছোটোলোক বলেচে কেন’? — বক্তা কে? এই উক্তির মধ্যে দিয়ে বক্তার চরিত্রের কী পরিচয় পাও?

৪.২ বেণী, রমা ও রমেশ — চরিত্র তিনটির তুলনামূলক আলোচনা করো। সেইসঙ্গে এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে কোন চরিত্রটি তোমার সবথেকে ভালো লেগেছে এবং কেন তা জানাও।

৪.৩ উপন্যাসের নামে পাঠ্যাংশটির নামকরণও ‘পল্লীসমাজ’ রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নামকরণটি সুপ্রযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে মতামত জানাও।

৪.৪ পল্লীসমাজ পাঠ্যাংশে সমান্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো নিদর্শন পেয়ে থাকলে সে সম্পর্কে আলোচনা করো। এ ধরনের ব্যবস্থার সুফল ও কুফল সম্পর্কে আলোচনা করো।

শব্দার্থ: সংবরণ — নিয়ন্ত্রণ। কোপালে — কোদাল দিয়ে মাটি কাটা। খুড়ো — কাকা। তদাবস্থায় — সেই অবস্থায়। বিহ্বল — হতভম্ব। অগোচর — ইন্দ্রিয়ের অতীত। বাগবিতন্ডা — তর্কাতর্কি। আল্লার কিরে — আল্লার নামে দিব্য বা শপথ গ্রহণ।

৫. **সন্ধি করো :**

বৃষ্ + তি =	সম্ + ববণ =	কাঁদ্ + না =
অতি + অন্ত =	অন্ + আত্মীয় =	এক + অন্ত =

৬. নীচের শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

নিরুত্তর, নমস্কার, তারকেশ্বর, যথার্থ, প্রত্যাখ্যান, আশ্চর্য, তদবস্থা

৭. নীচে দেওয়া শব্দগুলির দলবিশ্লেষণ করো :

অপরাহ্ণ, অকস্মাৎ, আহ্বান, দক্ষিণ, উচ্ছিষ্ট, উত্তপ্ত, বিস্ফারিত, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুপ্লাবিত, হিন্দুস্থানি, অস্বচ্ছ

৮. নীচে দেওয়া ব্যাসবাক্যগুলিকে সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করো কোনটি কী ধরনের সমাস তা নির্ণয় করো :

৮.১ জল ও কাদা =

৮.২ নয় আহত =

৮.৩ ত্রি অধিক দশ =

৮.৪ বেগের সহিত বর্তমান =

৮.৫ মড়ার জন্য কান্না =

৮.৬ চণ্ডী পুজোর জন্য তৈরি যে মণ্ডপ =

৯. নীচে বাক্যগুলিকে নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তন করো :

৯.১ কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। (যৌগিক বাক্যে)

৯.২ এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। (সরল বাক্যে)

৯.৩ ওরা যাবে কি? (নির্দেশক বাক্যে)

৯.৪ বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। (হ্যাঁ বাচক বাক্যে)

৯.৫ তুমি নীচ, অতি ছোটো। (যৌগিক বাক্যে)

৯.৬ পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৯.৭ মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। (জটিল বাক্যে)

১০. নীচে দেওয়া শব্দদুটিকে দুটি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্যরচনা করো :

যাত্রা, বাঁধ

ছন্নছাড়া

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে
গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া—
আঁকাবাঁকা শুকনো কতকগুলি কাঠির কঙ্কাল
শূন্যের দিকে এলোমেলো তুলে দেওয়া,
রুক্ষ রুষ্ট রিক্ত জীর্ণ
লতা নেই পাতা নেই ছায়া নেই ছাল-বাকল নেই
নেই কোথাও এক আঁচড় সবুজের প্রতিশ্রুতি
এক বিন্দু সরসের সম্ভাবনা।
ওই পথ দিয়ে
জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে।
ড্রাইভার বললে, ওদিকে যাব না।
দেখছেন না ছন্নছাড়া কটা বেকার ছোকরা
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে—
চোঙা প্যান্ট, চোখা জুতো, রোখা মেজাজ, ঠোকা কপাল—
ওখান দিয়ে গেলেই গাড়ি থামিয়ে লিফট চাইবে,
বলবে, হাওয়া খাওয়ান।

কারা ওরা?
চেনেন না ওদের?
ওরা বিরাট এক নৈরাজ্যের —এক নেই রাজ্যের বাসিন্দে।
ওদের কিছু নেই
ভিটে নেই ভিত নেই রীতি নেই নীতি নেই
আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই
শ্লীলতা-শালীনতা নেই।
ঘেঁষবেন না ওদের কাছে।

কেন নেই?
ওরা যে নেই রাজ্যের বাসিন্দে—

ওদের জন্যে কলেজে সিট নেই
অফিসে চাকরি নেই
কারখানায় কাজ নেই
ট্রামে-বাসে জায়গা নেই

মেলায়-খেলায় টিকিট নেই
হাসপাতালে বেড নেই
বাড়িতে ঘর নেই
খেলবার মাঠ নেই
অনুসরণ করবার নেতা নেই
প্রেরণা-জাগানো প্রেম নেই
ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারু দরদ নেই—
ঘরে-বাইরে উদাহরণ যা আছে
তা ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ নয়—
তা সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ—
শুধু নিজের দিকে ঝোল-টানা।
এক ছিল মধ্যবিত্ত বাড়ির এক চিলতে ফালতু এক রক
তাও দিয়েছে লোপাট করে।
তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।
কোত্থেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতি নেই
কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বর্তমানের গতি নেই
কোথায় চলেছে নেই সেই ভবিষ্যতের ঠিকানা।

সেচহীন ক্ষেত
মণি-হীন চোখ
চোখ-হীন মুখ
একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের স্তূপ।

আমি বললুম, না ওখান দিয়েই যাব,
ওখান দিয়েই আমার শর্টকাট
ওদের কাছাকাছি হতেই মুখ বাড়িয়ে
জিজ্ঞেস করলুম,
তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে? লিফট চাই?
আরে এই তো ট্যাক্সি, এই তো ট্যাক্সি, লে হালুয়া

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ওরা
সিটি দিয়ে উঠল
পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি চল পানসি বেলঘরিয়া।
তিন-তিনটে ছোকরা উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে,
বললুম, কদ্দুর যাবে।
এই কাছেই। ওই দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?
সিনেমা না, জলসা না, নয় কোনো ফিল্মি তারকার অভ্যর্থনা।
একটা নিরীহ লোক গাড়িচাপা পড়েছে,
চাপা দিয়ে গাড়িটা উধাও—
আমাদের দলের কয়েকজন গাড়িটার পিছে ধাওয়া করেছে
আমরা খালি ট্যাক্সি খুঁজছি।
কে সে লোক?
একটা বেওয়ারিশ ভিখিরি।
রক্তে-মাংসে দলা পাকিয়ে গেছে।
ওর কেউ নেই কিছু নেই
শোবার জন্যে ফুটপাথ আছে তো মাথার উপরে ছাদ নেই,
ভিক্ষার জন্যে পাত্র একটা আছে তো
তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ফুটো।
রক্তে মাখামাখি সেই দলা-পাকানো ভিখিরিকে
ওরা পাঁজাকোলা করে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে নিল।

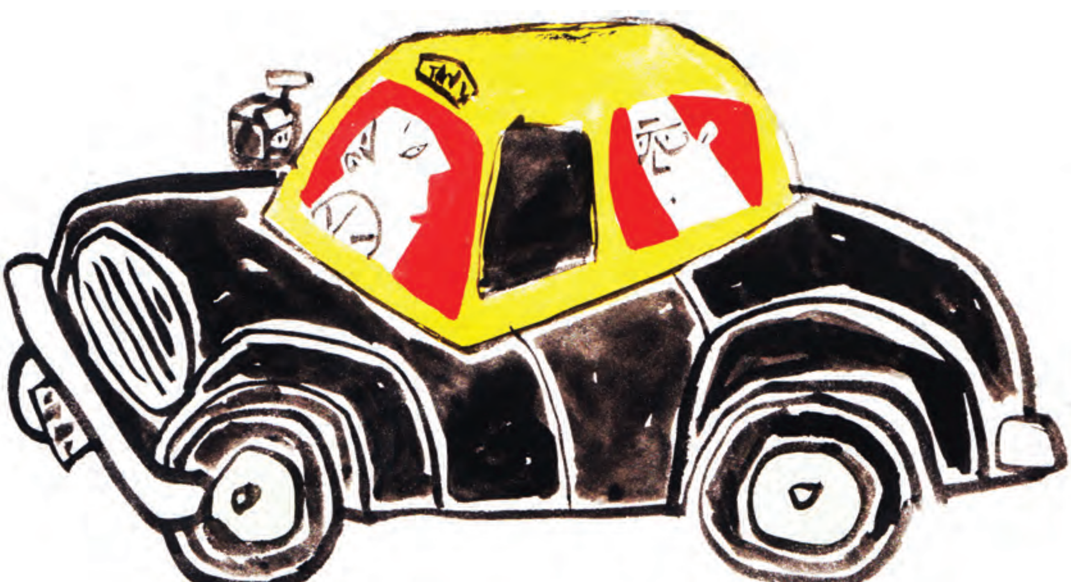

চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে — আনন্দে ঝংকৃত হয়ে —
প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে।

রক্তের দাগ থেকে আমার ভব্যতা ও শালীনতাকে বাঁচাতে গিয়ে
আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি।
তারপর সহসা শহরের সমস্ত কর্কশে-কঠিনে
সিমেন্টে-কংক্রিটে।
ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে দেয়ালে-দেয়ালে
বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ
এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি—
প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে,
প্রাণ থাকলেই স্থান আছে মান আছে
সমস্ত বাধানিষেধের বাইরেও
আছে অস্তিত্বের অধিকার।

ফিরে আসতেই দেখি
গলির মোড়ে গাছের সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ করে
বেরিয়ে পড়েছে হাজার-হাজার সোনালি কচি পাতা
মর্মরিত হচ্ছে বাতাসে,
দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে উঠেছে ফুল
ঢেলে দিয়েছে বুকের সুগন্ধ,
উড়ে এসেছে রং-বেরঙের পাখি
শুরু করেছে কলকণ্ঠের কাকলি,
ধীরে ধীরে ঘন পত্রপুঞ্জে ফেলেছে স্নেহার্দ্র দীর্ঘছায়া
যেন কোনো শ্যামল আত্মীয়তা।
অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে দেখলুম
কঠোরের প্রচ্ছন্নে মাধুর্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন।
প্রাণ আছে, প্রাণ আছে—শুধু প্রাণই আশ্চর্য সম্পদ
এক ক্ষয়হীন আশা
এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।

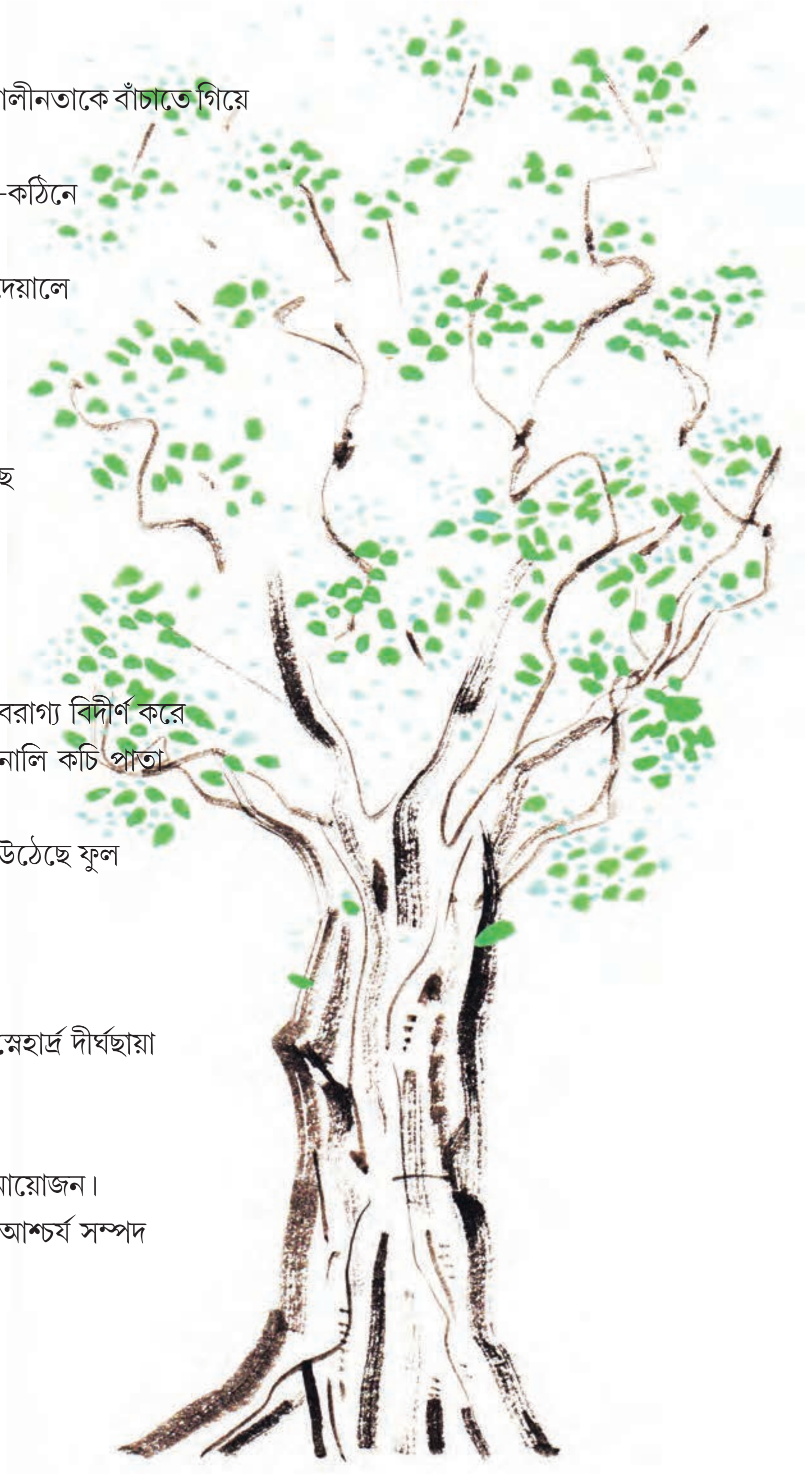

হাতেকলমে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩—১৯৭৬): জন্ম অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত নোয়াখালিতে। বিচিত্র কর্ম-অভিজ্ঞতার সাক্ষী এই লেখকের উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়, প্রাচীর ও প্রান্তর, অকালবসন্ত, অধিবাস, যতনাবিধি, সারেঙ* প্রভৃতি। *অমাবস্যা, আমরা, প্রিয়া ও পৃথিবী, নীল আকাশ, আজন্মসুরভি* তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। *কল্লোল* পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই লেখক -কবি *কল্লোলযুগ, কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ* প্রভৃতি স্মরণীয় প্রবন্ধ গ্রন্থেরও প্রণেতা।

১.১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে লেখো :**

২.১ কবি প্রথমে গাছটিকে কেমন অবস্থায় দেখেছিলেন?

২.২ ‘ড্রাইভার বললে, ওদিকে যাব না।’ — ওদিকে না যেতে চাওয়ার কারণ কী?

২.৩ ‘তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।’ —সড়কের মাঝখানে, পথে এসে দাঁড়ানোর কারণ কী?

২.৪ ‘আমি বললুম, না ওখান দিয়েই যাব।’ —কবির ‘ওখান’ দিয়েই যেতে চাওয়ার কারণ কী?

২.৫ ‘ওই দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?’ — ওখানে কীসের ভিড়?

২.৬ ‘কে সে লোক?’-‘লোক’ টির পরিচয় দাও।

২.৭ ‘চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে ....’ —কী বলে তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল?

২.৮ ‘আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি’ — কবি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন কেন?

২.৯ ‘ফিরে আসতেই দেখি ......’ — ফেরার পথে কবি কী দেখতে পেলেন?

২.১০ ‘অবিশ্বাস্য চোখে দেখলুম’—কবির চোখে অবিশ্বাসের ঘোর কেন?

৩. **নির্দেশ অনুসারে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৩.১ ‘ওই পথ দিয়ে

জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে।’

— কবির যাত্রাপথের অভিজ্ঞতার বিবরণ দাও।

৩.২ ‘গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে

গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া — ’

— একটি গাছ দাঁড়িয়ে আছে বলেও কেন পরের পঙ্‌ক্তিতে তাকে ‘গাছের প্রেতচ্ছায়া’ বলা হয়েছে তা বুঝিয়ে দাও।

৩.৩ ‘ওই পথ দিয়ে

জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে।’

— এভাবে কবিতায় উত্তমপুরুষের রীতি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্তত পাঁচটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দাও।

৩.৪ ‘কারা ওরা?’

— কবিতা অনুসরণে ওদের পরিচয় দাও?

৩.৫ ‘ঘেঁষবেন না ওদের কাছে।’

— এই সাবধানবাণী কে উচ্চারণ করেছেন? ‘ওদের’ বলতে কাদের কথা বোঝানো হয়েছে? ওদের কাছে না ঘেঁষার পরামর্শ দেওয়া হলো কেন?

৩.৬ ‘তাই এখন এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।’

— এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের জীবনের এমন পরিণতির কারণ কবিতায় কীভাবে ধরা পড়েছে তা নির্দেশ করো।

৩.৭ ‘জিজ্ঞেস করলুম

তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে?’

— প্রশ্নবাক্যটিতে প্রশ্নকর্তার কোন অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে? তাঁর এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়ার পর কীরূপ পরিস্থিতি তৈরি হলো?

৩.৮ ‘প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে।’

— এই দুর্মর আশাবাদের ‘তপ্ত শঙ্খধ্বনি’ কবিতায় কীভাবে বিঘোষিত হয়েছে তা আলোচনা করো।

৩.৯ কবিতায় নিজের ভব্যতা ও শালীনতাকে বাঁচাতে চাওয়া মানুষটির ‘ছন্নছাড়া’-দের প্রতি যে অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তা বুঝিয়ে দাও।

৩.১০ কবিতায় ‘গাছটি’ কীভাবে প্রাণের প্রতীক হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করো।

৩.১১ ‘এক ক্ষয়হীন আশা

এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।’

— ‘প্রাণকে’ কবির এমন অভিধায় অভিহিত করার সঙ্গত কারণ নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো।

শব্দার্থ: প্রেতচ্ছায়া — প্রেত বা পিশাচের ছায়া । বাকল — গাছের ছাল। ছন্নছাড়া — বাউন্ডুলে। ক্ষুধাহরণ — খাবার ইচ্ছা চলে যাওয়া। সুধাক্ষরণ — অমৃত নিঃসরণ। ভব্যতা — ভদ্রতা। শালীনতা — লজ্জাশীলতা। স্নেহার্দ্র — স্নেহ দ্বারা আর্দ্র। প্রচ্ছন্ন — আবৃত, আচ্ছন্ন। মাধুর্য — মাধুরী, সৌন্দর্য।

৪. **নীচের প্রতিটি শব্দের দল বিভাজন করে দেখাও:**

এলোমেলো, ছন্নছাড়া, নৈরাজ্যে, বাসিন্দে, শালীনতা, আত্মীয়তা, শঙ্খধ্বনি, পত্রপুঞ্জে

৫. **নীচের প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো:**

বর্তমান, ভদ্রতা, সম্ভাষণ, গতি, ভিখিরি, ভব্যতা, বৃষ্ট, জিজ্ঞেস, পিছে

৬. **নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন কোন নিয়ম কাজ করেছে তা দেখাও:**

জুতো, বাসিন্দে, ক্ষেত, চোখ, কদ্দুর, ভিখিরি।

৭. **নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো:**

প্রেতচ্ছায়া, ছাল-বাকল, ক্ষুধাহরণ, সোল্লাসে, স্নেহার্দ্র, শঙ্খধ্বনি

৮. **কোন শব্দে কী উপসর্গ আছে আলাদা করে দেখাও:**

প্রতিশ্রুতি, বেওয়ারিশ, অনুসরণ, প্রচ্ছন্ন, অভ্যর্থনা, অধিকার

৯. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৯.১ ওই পথ দিয়ে জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে। (জটিল বাক্যে)

৯.২ দেখছেন না ছন্নছাড়া কটা বেকার ছোকরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে— (যৌগিক বাক্যে)

৯.৩ কারা ওরা? (প্রশ্ন পরিহার করো)

৯.৪ ঘেঁষবেন না ওদের কাছে। (ইতিবাচক বাক্যে)

৯.৫ একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের স্তূপ। (না-সূচক বাক্যে)

৯.৬ জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে? (পরোক্ষ উক্তিতে)

৯.৭ আমরা খালি ট্যাক্সি খুঁজছি। (জটিল বাক্যে)

৯.৮ দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে উঠেছে ফুল (ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো)

গাঁয়ের বধূ

সলিল চৌধুরী

কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো
রূপকথা নয় সে নয়
জীবনের মধুমাসের কুসুম-ছিঁড়ে-গাঁথা মালা
শিশির-ভেজা কাহিনি শোনাই শোনো।
একটুখানি শ্যামল-ঘেরা কুটিরে তার স্বপ্ন শত শত
দেখা দিত ধানের শিষের ইশারাতে
দিবাশেষে কিষাণ যখন আসত ফিরে
ঘি মউ মউ আম-কাঁঠালের পিঁড়িটিতে বসত তখন,
সবখানি মন উজাড় করে দিত তারে কিষাণী
সেই কাহিনি শোনাই শোনো।
ঘুঘু ডাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি কোন মায়াভরে
শ্রান্তজনে হাতছানিতে ডাকত কাছে আদর করে সোহাগ ভরে

নীল শালুকে দোলন দিয়ে রং ফানুসে ভেসে
ঘুমপরি সে ঘুম পাড়াত এসে কখন জাদু করে
ভোমরা যেত গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে।
আকাশে বাতাসে সেথায় ছিল পাকা ধানের বাসে বাসে
সবার নিমন্ত্রণ।
সেখানে বারো মাসে তেরো পাবন আষাঢ় শ্রাবণ কি বৈশাখে
গাঁয়ের বধূর শাঁখের ডাকে লক্ষ্মী এসে ভরে দিত
গোলা সবার ঘরে ঘরে।
হায়রে কখন এল শমন অনাহারের বেশেতে
সেই কাহিনি শোনাই শোনো।
ডাকিনী যোগিনী এল শত নাগিনী
এল পিশাচেরা এল রে।
শত পাকে বাঁধিয়া নাচে তাথা তাথিয়া
নাচে তাথা তাথিয়া নাচে রে।
কুটিলের মন্ত্রে শোষণের যন্ত্রে
গেল প্রাণ শত প্রাণ গেল রে।
মায়ার কুটিরে নিল রস লুটি রে
মরুর রসনা এল রে।
হায় সেই মায়া-ঘেরা সন্ধ্যা
ডেকে যেত কত নিশিগন্ধা
হায় বধূ সুন্দরী কোথায় তোমার সেই
মধুর জীবন মধুছন্দা।
হায় সেই সোনাভরা প্রান্তর
সোনালি স্বপনভরা অন্তর
হায় সেই কিষাণের কিষাণীর জীবনের
ব্যথার পাষাণ আমি বহিরে।
আজও যদি তুমি কোনো গাঁয়ে দেখো
ভাঙা কুটিরের সারি।
জেনো সেইখানে সে গাঁয়ের বধূর
আশা-স্বপনের সমাধি।।

সলিল চৌধুরী (১৯২৩-১৯৯৫) : বিখ্যাত গীতিকার, সুরকার, কবি এবং নাট্যকার। চলচ্চিত্র-সংগীতের দুনিয়াতেও তিনি অসামান্য সাফল্য পেয়েছিলেন। কাজ করেছেন বাংলা, হিন্দি ও মালয়ালম ছবিতে। পেয়েছেন ‘ফিল্মফেয়ার’ পুরস্কার (১৯০৮) এবং ‘সংগীত নাটক আকাদেমি’ পুরস্কার (১৯৮৮)। এই গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গাছের কথা

জগদীশচন্দ্র বসু

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখি, কীটপতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্যে ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি-ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুত্ব হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবনদান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। ক্রমে এসব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে করো, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। একসময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে

ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলো তো, এই গাছ আর এই মরা ডালে কী প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একটিতে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে; অর্থাৎ তাহারা নড়েচড়ে। অবশ্য গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম নেয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাকনা; তাহার মধ্যে বৃক্ষশিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোটো, কোনোটি বড়ো। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড়ো হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোটো বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড়ো গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বনজঙ্গল দেখো, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলোর সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিনরাত্রি দেশদেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কিনা, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে তার অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষশিশু অনেকদিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাকনা গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন-কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে করো, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড়ো ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোটো ছোটো ডাল ছিঁড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে করো, একটি বীজ সমস্ত দিনরাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল! ক্রমে ধুলো ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষশিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাইরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষশিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

হাতেকলমে

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮—১৯৩৭) : বিজ্ঞানসাধক, পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী এই লেখকের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ জগদীশচন্দ্র বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি ১৩২৩-১৩২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত বাংলা রচনাগুলি *অব্যক্ত* গ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলায় লেখা তাঁর চিঠিপত্র *পত্রাবলী* নামে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১.১ জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো?

১.২ জগদীশচন্দ্র বসু কী আবিষ্কার করেছিলেন?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে লেখো :

২.১ লেখক কবে থেকে গাছদের অনেক কথা বুঝতে পারেন?

২.২ ‘ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়।’ — কী দেখা যায়?

২.৩ জীবিতের লক্ষণ কী তা লেখক অনুসরণে উল্লেখ করো।

২.৪ ‘বৃক্ষ শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়।’ — বৃক্ষশিশু কোথায় নিদ্রা যায়?

২.৫ অঙ্কুর বের হবার জন্য কী কী প্রয়োজন?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৩.১ ‘আগে এসব কিছুই জানিতাম না।’ — কোন বিষয়টি লেখকের কাছে অজানা ছিল?

৩.২ ‘ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়।’ — কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের মধ্যে কী লক্ষ করা যায়?

৩.৩ ‘গাছের জীবন মানুষের ছায়ামাত্র।’ — লেখকের এমন উক্তি অবতারণার কারণ বিশ্লেষণ করো।

৩.৪ জীবনের ধর্ম কীভাবে রচনাংশটিতে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

৩.৫ ‘নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়।’ — উপায়গুলি পাঠ্যাংশ অনুসরণে আলোচনা করো।

৩.৬ লেখক তাঁর ছেলেবেলার কথা পাঠ্যাংশে কীভাবে স্মরণ করেছেন, তা আলোচনা করো।

৩.৭ ‘ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে।’ — উদ্ধৃতিটির সাপেক্ষে নীচের ছকটি পূরণ করো।

বীজ	কোন ঋতুতে পাকে
১	
২	
৩	
৪	
৫	

৩.৮ ‘পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে লইলেন।’ — বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে লেখকের গভীর উপলব্ধি উদ্ধৃতিটিতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করো।

৩.৯ ‘প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কিনা, কেহ বলিতে পারে না।’ — বীজ থেকে গাছের জন্মের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলি আলোচনা করো।

৩.১০ ‘তখন সব খালি-খালি লাগিত।’ — কখনকার অনুভূতির কথা বলা হলো? কেন তখন সব খালি-খালি লাগত? ক্রমশ তা কীভাবে অন্য চেহারা পেল তা পাঠ্যাংশ অনুসরণে বুঝিয়ে দাও।

৪. নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :

৪.১ আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। (সরল বাক্যে)

৪.২ তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৪.৩ ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। (জটিল বাক্যে)

৪.৪ তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। (না-সূচক বাক্যে)

৪.৫ প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? (প্রশ্ন পারিহার করো)

৫. নীচের শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

কীটপতঙ্গ, স্বার্থত্যাগ, বৃক্ষশিশু, বনজঙ্গল, জনমানবশূন্য, দিনরাত্রি, দেশান্তরে, নিরাপদ।

৬. নিম্নরেখাঙ্কিত অংশের কারক-বিভক্তি নির্দেশ করো :

৬.১ ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুত্ব হয়।

৬.২ আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না।

৬.৩ বীজ দেখিয়া গাছ কত বড়ো হইবে বলা যায় না।

৬.৪ মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়।

৭. সন্ধিবদ্ধ পদগুলি খুঁজে নিয়ে সন্ধি-বিচ্ছেদ করো :

৭.১ তাহার মধ্যে বৃক্ষশিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়।

৭.২ অতি প্রকাণ্ড বটগাছ. সরিষা অপেক্ষা ছোটো বীজ হইতে জন্মে।

৭.৩ এই প্রকারে দিনরাত্রি দেশদেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

হাওয়ার গান

বুদ্ধদেব বসু

হাওয়াদের বাড়ি নেই, হাওয়াদের বাড়ি নেই,
নেই রে।
তারা শুধু কেঁদে মরে বাইরে।
সারা-দিন-রাত্রির বুক-চাপা কান্নায়
নিশ্বাস ব'য়ে যায় উত্তাল, অস্থির—
সে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে
বলে তারা, 'পৃথিবীর সব জল, সব তীর
ছুঁয়ে গেছি বার-বার দুর্বার ইচ্ছায়,
তবু নেই, সে তো নেই , নেই রে।
সব জল, সব তীর পাহাড়ের গম্ভীর
বন্দর, বন্দর, নগরের ঘন ভিড়,
অরণ্য, প্রান্তর শূন্য তেপান্তর—
সব পথে ঘুরেছি বৃথাই রে।
পার্কের বেঞ্চিতে ঝরা পাতা ঝর্ঝর,
শার্সিতে কেঁপে-ওঠা দেয়ালের পঞ্জর
চিমনির নিস্বনে, কাননের ক্রন্দনে
তার কথা কেবলই শুধাই রে।
তেমনি মিষ্টি ছেলে দোলনায় ঘুম যায়,
আবছায়া কার্পেটে কুকুরের তন্দ্রায়,
ঘরে ঘরে জ্বলে যায় স্বপ্নের মৃদু মোম—
সে-ই শুধু নিয়েছে বিদায় রে।
আঁধারে জাহাজ চলে, মাস্তুলে জ্বলে দীপ,
যাত্রীরা সিনেমায়, কেউ নাচে, গান গায়;
আমরা তরঙ্গের বুকে হানি প্রশ্নের
অবিরাম নর্তন, মত্ত আবর্তন—
সে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে।

অবশেষে থামে সব, ডেক হয় নির্জন,
অকূল অন্ধকারে ফেটে পড়ে গর্জন,
সমুদ্র ওঠে দুলে, বাঁকা চাঁদ পড়ে ঝুলে—
আমাদের বিশ্রাম নেই, রে।
আমাদের বাড়ি নেই, দেশ নেই, শেষ নেই,
কেঁদে-কেঁদে মরি শুধু বাইরে,
বার-বার পারাপার যত করি, তবু তার
নেই, নেই, দেখা নেই, নেই রে।
সময় অন্তহীন, অফুরান সন্ধান,
বিশ্বের বুক ফেটে বয়ে যায় এই গান—
কোনখানে গেলে তারে পাই রে।
খুঁজে-খুঁজে ঘুরে ফিরি বাইরে,
সুরে-সুরে ব'লে যাই— নেই রে,
চিরকাল উত্তাল তাই রে।'

হাতেকলমে

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) : কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ও সমালোচক। সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। বুদ্ধদেব রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *বন্দীর বন্দনা*, *কঙ্কাবতী*, *দ্রৌপদীর শাড়ি*, *যে আঁধার আলোর অধিক*, *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*। তিনি *কবিতা* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শিশুদের জন্য লিখেছেন *কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড*, *ঘুমপাড়ানি*, *এলোমেলো* প্রভৃতি রচনা। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন বহুমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

১.১ বুদ্ধদেব বসু রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করতেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি/দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ দুর্বার ইচ্ছায় হাওয়া কী কী ছুঁয়ে গেছে?

২.২ তার কথা হাওয়া কোথায় শুধায়?

২.৩ মাস্তুলে দীপ জ্বলে কেন?

২.৪ পার্কের বেঞ্চিতে আর শার্সিতে কাদের উপস্থিতির চিহ্ন রয়েছে?

২.৫ নিশ্বাস কেমন করে বয়ে গেছে?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :**

৩.১ হাওয়ার চোখে ঘরের যে ছবি পাওয়া যায়, তা কবিতা অনুসরণে লেখো।

৩.২ সমুদ্রের জাহাজের চলার বর্ণনা দাও।

৩.৩ পৃথিবীর কোন কোন অংশে হাওয়া ঘুরে বেড়ায় লেখো।

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর বিশদে লেখো :**

৪.১ হাওয়াদের কী নেই? হাওয়ারা কোথায় কীভাবে তার খোঁজ করে?

৪.২ 'চিরকাল উত্তাল তাই রে'— কে চিরকাল উত্তাল? কেন সে চিরকাল উত্তাল হয়ে রইল?

৪.৩ কবিতাটির নাম 'হাওয়ার গান' দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী যুক্তি কবির মনে এসেছিল বলে তোমার মনে হয়?

শব্দার্থ : পঞ্জর — পাঁজর। পারাপার — একূল ওকূল পার হওয়া। অফুরান — যা ফুরায় না।

৫. **নীচের পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে ক্রিয়া কে চিহ্নিত করো এবং অন্যান্য শব্দগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখাও।**

৫.১ ঘরে ঘরে জ্বলে যায় স্বপ্নের মৃদু মোম

৫.২ আঁধারে জাহাজ চলে

৫.৩ শার্সিতে কেঁপে-ওঠা দেয়ালের পঞ্জর

৫.৪ অকূল অন্ধকারে ফেটে পড়ে গর্জন

৬. ‘বন্দর, বন্দর নগরের ঘন ভিড়’ — পঙ্‌ক্তিটির প্রথমে একই শব্দ দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। এই রকম আরো চারটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করো। কবিতার ক্ষেত্রে এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের কৌশল অবলম্বনের কারণ কী?

৭. **ধ্বনি পরিবর্তনের দিক থেকে শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করো:**

☐ > চন্দ্র > ☐

☐ > রাত্তির

পঞ্জর > ☐

৯. ‘হাওয়ার গান’ কবিতায় ব্যবহৃত পাঁচটি ইংরেজি শব্দ লেখো। এই শব্দগুলির বদলে দেশি/বাংলা শব্দ ব্যবহার করে পঙ্‌ক্তিগুলি আবার লেখো।

কী করে বুঝব আশাপূর্ণা দেবী

ছ-বছরের বুকু বাড়ির বাইরের রোয়াকে বসে খেলা করছিল। বাড়ির সামনে একখানা রিকশাগাড়ি এসে থামল। রিকশা থেকে নামলেন দুটি বেজায় মোটাসোটা ভদ্রমহিলা আর একটি বুকুর মতো বয়েসেরই ছেলে। সেটিও নেহাত রোগা নয়।

বুকু খেলতে খেলতে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়, আরে বাবা! রিকশাগাড়ির অতটুকু খোলের মধ্যে এদের জায়গা হয়েছিল কী করে?

দুটি মহিলার মধ্যে একটি মহিলা রোয়াকে উঠে একগাল হেসে বলেন, 'কী খোকা, চিনতে পারছ?'

বুকু দুই কোমরে দুই হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের দিকে সোজা তাকিয়ে যেন বেশ তলিয়ে একটু ভেবে নেয়,

তারপর গম্ভীরভাবে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দু-দিকে মাথা নাড়ে।

মহিলা দুটি তো ওর ধরন দেখে হেসেই খুন!

একজন বলেন, 'আহা আমরা এসেছিলাম সে-ই কবে ! ওর মনে থাকবে কী করে !'

বুকু বিজ্ঞের মতো বলে, 'তাছাড়া তখন হয়তো এত মোটা ছিলেন না আপনারা । এত মোটা কাউকে দেখিইনি কক্ষনো!'

শুনেই দুজনের মধ্যে একজনের মুখ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, আর একজন কিন্তু হেসে ওঠেন। খুকখুক করে হাসতে হাসতে বলেন, 'নির্মলার ছেলেটি তো আচ্ছা মজার কথা বলে! তা, তোমার মা বাড়ি আছেন তো খোকা?'

'হ্যাঁ।'

'চলো।' বলে এঁরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েন।

শুধু ঢুকে পড়েন না, একেবারে বসেই পড়েন। ... বাইরের ঘরের হালকা-হালকা দু-খানা বেতের চেয়ারের মধ্যে নিজেদেরকে বেশ কায়দা করে ঠেসে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'কই খোকা, তোমার মা?'

'মা! মা তো সেই তিনতলার ছাতে, রান্নাঘরে।'

'ওরে বাবা!' আঁতকে ওঠেন এঁরা— 'তিনতলায়! সিঁড়ি ভেঙে আর উঠতে পারব না বাবা, রক্ষে করো ! উঃ বাড়ি থেকে কি আজ বেরিয়েছি? বার দু-তিন বাসবদল, শেষ অবধি রিকশায়। ... যাও দিকিন বাবা ছুটে, তিনতলায় গিয়ে খবর দিয়ে এসো তোমার মাকে। বলো গে ... উত্তরপাড়া থেকে ছেনুমাসিরা এসেছেন।'

বুকু ছুটে ওপরে চলে যায়।

ইত্যবসরে নতুন -আসা ছেলেটি, যার নাম ডাম্বল, চেয়ারে গুছিয়ে বসার বদলে একখানা চেয়ার কনুইয়ের ধাক্কায় উলটেছে, টেবিল-ঢাকাটা কুঁচকে টেনে খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়েছে, টেবিলের ওপরকার খাতাপত্তরগুলো এলোমেলো করেছে। এক্কেবারে ঘরের ওদিককার দেয়ালে রাখা আলমারিটার একটা পাল্লা ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে, চাবিবন্ধ কলটা বন্ধ অবস্থাতেই পাল্লার সঙ্গে খুলে বেরিয়ে এসেছে ... সাজানো গোছানো বইয়ের সারি থেকে একসঙ্গে তিন-চারখানা বই নামিয়েই — 'দূর ছাই, ছবি নেই' -বলে বইগুলো মাটিতে ফেলে রেখে, অবশেষে জানালার ধাপের ওপর উঠে বসে পা দোলাতে শুরু করেছে।

বুকু এসে বলল, 'মা আসছেন। বললেন যে— ও কী! কী কাণ্ড করেছ তুমি? আলমারি ভেঙে বই নামিয়েছ?

ডাম্বল অগ্রাহ্যভরে বুকুর দিকে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে উত্তর দেয়, 'ইশ! আলমারি ভেঙে। একেবারে

গুঁড়িয়ে ছাতু করে ফেলেছি বলো। শুধু তো খুলেছি।'

বুকু জোরগলায় বলে 'তা খুলেছই বা কেন? ও-বই কার, তা জানো? সেজোকাকার! সেজোকাকার বই মাটিতে! ... ইঃ!'

বুকুর কথার ধরনেই বোঝা যায়, 'সেজোকাকা' লোকটি বিশেষ মোলায়েম নয়।

ডাম্বল কিন্তু বুকুর ভয়ের ধার ধারে না। ঠোঁট উলটে বলে, 'এঃ, ভারি তো বই ! হতচ্ছাড়া বই! ছবি নেই।'

বুকু গম্ভীরভাবে বলে, 'ছবি থাকবে কী জন্যে? ও কি ছোটোদের বই? ও তো বড়োদের বই। যেমন হাতির মতো চেহারা তোমার, তেমনই হাতির মতো বুদ্ধি। আচ্ছা আসুক না সেজোকাকা; মজা দেখিয়ে দেবেন একেবারে! পিঠের ছাল তুলবেন তোমার!'

মোটা মহিলা দুটি, যাঁদের মধ্যে একজনের নাম— ছেনুমাসি আর অন্যটির নাম বেণুমাসি, তাঁরা চোখ ড্যাবড্যাব করে বুকুর কথা শুনছিলেন, এইবার রেগে গমগম করে ছেলেকে বললেন, 'ডাম্বল! বই তুলে রাখো! সব জায়গা নিজের বাড়ি নয়, বুঝলে?'

এইতেই ছেলেকে শাসন করা হয়ে গেল ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁরা মনে মনে বুকুর মুণ্ডুপাত করেন। ... কী অসভ্য ছেলে বাবা! কথা নয় তো, যেন ইটপাটকেল ! ছেলেকে কী শিক্ষাই দিয়েছে নির্মলা। এইবার ঘরে এসে ঢোকেন বুকুর মা নির্মলা, আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে। ঢোকা দেখেই বোঝা যায়, কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরে ঢুকেই হইহই করে অভ্যর্থনা শুরু করে দেন— 'ওমা, আমার কী ভাগ্যি! ছেনুমাসি বেণুমাসি যে! এতদিনে বুঝি মনে পড়ল? আমি তো

ভেবেছিলাম, ভুলেই গেছ আমাকে। সত্যি কতকাল পরে দেখা — কী আনন্দ যে হচ্ছে কী করে বলব! এত ভালো লাগছে ছেনুমাসি—'

বুকুর মা যতক্ষণ কথা কইছিলেন, বুকু অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কথা শেষ হতেই বলে ওঠে , 'ও কী মা? এই মাত্তর যে বললে— বাবারে, শুনে গা জ্বলে গেল! অসময়ে লোক বেড়াতে আসা। ভালো লাগে না— এখন আবার ভালো লাগছে বলছ কেন?'

ছেলের কথা শুনেই বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত! এ কী সর্বনেশে ছেলে!

তিনি না হয় বলেই ফেলেছেন দুটো কথা তাই বলে এমনি করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে? ওদিকে ছেনু-বেণু দুই বোনের দুই দু-গুণে চারটি চোখ কপালে উঠে গেছে। তাঁরা বলে কত তোড়জোড় করে সেই উত্তরপাড়া থেকে ভবানীপুরে ছুটে এসেছেন পাতানো বোনঝিটির সঙ্গে দেখা করতে, আর তার কাছে কিনা এই অভ্যর্থনা! এদিকে বুকুর মা-র যে সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে, তা তো আর এঁরা জানেন না। সে কথা অবিশ্যি ফাঁস করেন না বুকুর মা, ছেলের কথার উপর ঝাপটা মেরে বলেন, 'কী শুনতে কী শুনিস হতভাগা ছেলে, যা হয় বললেই হলো?'

ছেনুমাসি চালতা চালতা গাল ফুলিয়ে তালের মতো করে গম্ভীরভাবে বলেন, 'আহা— তা ছেলেকে গাল দিচ্ছ কেন নির্মলা? সত্যিই তো অসময়ে এসে পড়ে কাজের ক্ষতি করে দিলাম।'

বুকুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'কিচ্ছু না মাসিমা, এ সময়ে কোনো কাজ থাকে না আমার; এখন বিকেলবেলায় আবার এত কী কাজ?'

কিন্তু বুকু শেষ করতে দেয় না। টপ করে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বাঃ কাজ নেই কী? এখনই তো গাদা গাদা

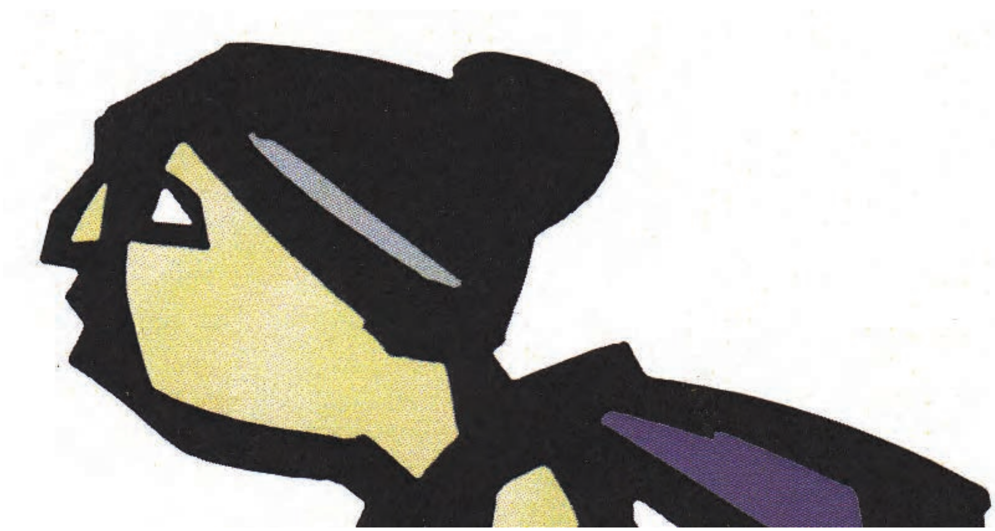

কাজ! সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে না আমাদের? বাবা এলেই তো চলে যাব, তাড়াতাড়ি বুটি-টুটি সব করে নেবে না?'

এত তাড়াতাড়ি কথা বলে বুকু , তাকে আর কথার মাঝখানে থামানো যায় না।

এরপর যদি বুকুর মা কালো ছেলের কান মলে লাল করে ছাড়েন, দোষ দেওয়া যায় তাঁকে?

কান মলে দিয়ে ধমক দেন , 'যা বেরো হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! ভূতে পেয়েছে নাকি আজকে? সত্যি এ ছেলেকে ধরে আছাড় মারলে রাগ যায়। তোমরাই বলো ছেনুমাসি? কেবল বানিয়ে কথা বলে।'

বুকু চলে যেতে বুকুর মা ডাম্বলকে নিয়ে পড়েন। 'ওমা ডাম্বল যে! দেখিনি এতক্ষণ! এত বড়ো হয়ে গেছে? আর কী সুন্দর দেখতে হয়েছে! বেণুমাসি, তোমার এই ছেলেটিই বোধহয় সবচেয়ে ফরসা, তাই না!'

একেই তো পরের কালো ছেলেকে ফরসা বলা, বিচ্ছু ছেলেকে সোনা ছেলে বলা নিয়ম, তাছাড়া আবার নিজের ছেলের বেয়াড়া কথাগুলো ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য বেশি করেই বলতে হয় বুকুর মাকে। নইলে সত্যি কিছু আর ডাম্বল আহামরি ফরসা নয়।

বেণুমাসি এবারে একটু প্রসন্ন হয়ে বলেন, 'না ডাম্বলও ছেলেবেলায় ওইরকম ছিল। এখন রোদে ঘুরে ঘুরে — তা, তোমার বুকুও তো কালো হয়ে গেছে।'

'আমার বুকু তো কালোই ছিল।. . . তারপর ডাম্বলবাবু, কী পড়তে-টড়তে শিখলে? ইস্কুলে ভরতি হয়েছ নাকি?'

বেণুমাসি কী বলতে যাচ্ছিলেন, ডাম্বল তড়বড় করে বলে ওঠে, 'কাঁচকলা! ইস্কুলে ভরতি করে দিলে তো। আমার বাবাটি যে হাড়কেপ্পন! বলেন , সাত বছরের ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাত টাকা! পারব না দিতে। পড়ে দরকার নেই, চাষবাস করে খাবে।'

এবারে বেণুমাসির মুখ চুন!

ছোটো ছেলেদের সামনে যথেচ্ছ কথা বলার ফল টের পান। ছোটো বোনকে সামলাতে ছেনুমাসি হি-হি করে হেসে বলে ওঠেন, 'তোর ছেলেটা কী পাকা পাকা কথা শিখেছে বেণু, শুনলেই হাসি পায়। বাব্বা! ছেলের মুখে যেন খই ফুটছে।'

ইত্যবসরে বেণুমাসি ধাতস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, 'আজকালকার সব ছেলেই ওইরকম, দিদি। এই এক্ষুনি দেখলে না, নির্মলার ছেলে বুকু, ডাম্বল বই দু-খানায় একটু হাত দেবার জন্যে কীরকম শাসাল? বলে কিনা— যেমন হাতির মতো দেখতে, তেমনই হাতির মতো বুদ্ধি! সেজোকাকা তোমার পিঠের ছাল তুলবেন— এইসব।' টেনে টেনে হাসতে থাকেন বেণুমাসি।

শুনে তো বুকুর মা-র আক্কেল গুড়ুম! হঠাৎ আজ কী হলো ছেলেটার। সত্যিই ভূতে-টুতে পেল নাকি! কই এমন অদ্ভুত বেয়াড়া তো ছিল না। কী আর করেন। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, 'সত্যি! এই ছেলেকে নিয়ে যে আমাদের কী জ্বালাই হয়েছে ছেনুমাসি, হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল । যত বড়ো হচ্ছে, তত যেন যা-তা হয়ে যাচ্ছে! কে জানে পাগলা-টাগলা হয়ে যাবে নাকি!'

পাগলা বললে যদি দোষ খণ্ডায়! ছেনুমাসিরা অবিশ্যি তেমন বোকা নয় যে, সহজে ছেলেকে পাগল বললেই তাই বিশ্বাস করবেন। মনে মনে ভাবেন . . . মোটেই তা নয়, বরং পাগল বানাতে পারে লোককে।

হঠাৎ একটা হুড়মুড় ঝনঝন শব্দে তিনজনই চমকে ওঠেন। আর কিছু নয়, শেলফের উপর থেকে টেবিল ল্যাম্পটাকে ফেলে ভেঙে শেষ করেছে ডাম্বল।

এবারে আবার ছেনু বেণু দুই বোনের অপ্রতিভ হওয়ার পালা, কিন্তু বুকুর মা 'হ্যাঁ- হ্যাঁ' করে ওঠেন— 'আহা আহা, যাক বেণুমাসি, ছেলেকে আর বকতে হবে না। ছোটো ছেলে দুরন্ত হবে না একটু? মাটির পুতুলের মতোন চুপ করে থাকবে? ছটফটে ছেলেই আমার ভালো লাগে।'

কাচ কুড়োতে বুকুর মা আরও বলেন, 'যে ছেলেরা ছোটোবেলায় দুরন্ত থাকে, তারাই নাকি বড়ো হয়ে মহাপুরুষ হয়'।

তারপর গল্প চলে। যত সব মেয়েলি গল্প আর কী। কবে মেয়ের বিয়ে হলো, কাদের বউয়ের কী কী গয়না হলো, শাড়ির আজকাল কীরকম জলের দর হয়ে গেছে— ছেনুমাসিরা তো আলমারি বোঝাই করে ফেলেছেন শাড়ি কিনে কিনে, বুকুর মা রাখছেন না কেন এই বেলা— এইসব আলোচনা।

গল্প থামাতে হয়, বুকু আর বুকুর সেজো খুড়িমা দুজনে মিলে অতিথিদের জন্যে চা আর খাবার নিয়ে আসেন। বড়ো বড়ো রাজভোগ, ভালো ভালো সন্দেশ, শিঙাড়া, নিমকি—

ছেনুমাসিরা 'খাব না, খাব না' করেন; অবিশ্যি যেন ভয়ানক একটা কষ্টকর কাজ করছেন এইভাবে খেয়ে ফেলেনও সবই। ডাম্বল গাঁউ গাঁউ করে সব কিছু খেয়ে ফেলে, রেকাবির রস চাটে বসে বসে।

বুকর মা বলেন, 'এই বুকু, তোর বাবা এসেছেন আপিস থেকে? বল গে যা, মাসিমারা এসেছেন।'

'তা বাবা খুব জানেন! সেইজন্যেই তো চটেমটে লাল হয়ে বসে আছেন। বললেন — খুব যা হোক, ছেনুমাসিরা বেড়াতে আসার আর দিন পেলেন না! আমাদের সিনেমার টিকিটগুলো পচাবার জন্যে বেছে বেছে আজই আসতে ইচ্ছে হলো!'

হায়-হায়! কী করবেন বুকুর মা! ছেলেকে চড় কষাবেন , নিজেরই গালে -মুখে চড়াবেন? এ আবার কী ভীষণ শত্রুতা শুরু করেছে আজ বুকু। আর কী বলে মুখরক্ষা করবেন নিজের?

শুধু মনে মনে ভাবতে থাকেন, এরা একবার উঠলে হয়। ছেলের হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করে ছাড়বেন।

শুধু হাত দিয়ে পেরে উঠবেন, না লাঠিসোঁটা ধরবেন? ছেনুমাসিরা বিশ্বস্তর মূর্তিতে বলেন, 'আচ্ছা তাহলে উঠি নির্মলা, তোমার অনেক ক্ষতি করে গেলাম—'

বুকুর মা কোন মুখে এ আর বলবেন— আবার একদিন এসো ছেনুমাসি! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বোকার মতো। ডাম্বল জুতোর মধ্যে পা গলাতে গলাতে বুকুকে বলে, 'আমায় তো খুব বলা হচ্ছিল, তুই ইস্কুলে ভরতি হয়েছিস?'

বুকু বুক টান করে বলে, 'নিশ্চয়!'

'কোন স্কুল?'

'আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।'

'ক-খানা বই রে?'

'সে অনেক। সবমিলিয়ে সাত-আটটা। ... বাবাঃ আর কত দেরি করবে তোমরা? যাও এবার! রাত্তির

হয়ে গেল যে! এখন মা কখনই-বা রান্না করবেন, আর কখনই-বা তোমাদের নিন্দে করবেন?'

'নিন্দে ... !'

ছেনুমাসিরা শুধু হার্টফেল করতে বাকি রাখেন।

আর বুকুর মা?

তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, হার্টফেল করেইছেন বুঝি-বা!

এবারে ডাম্বল ঘুসি পাকিয়ে আসে— 'নিন্দে কেন রে! নিন্দে কীসের?'

'বাঃ নিন্দে করা হবে না?' বুকু যেন অবাক হয়ে গিয়েছে, এইভাবে বলে 'বেড়াতে-আসা লোক চলে গেলে, নিন্দে করতে হয় না তাদের ? বলতে হবে না— ছেলেটা কী অসভ্য হ্যাংলা— মাসিরা কী অহংকারী— এসে তো মাথা কিনলেন, শুধু শুধু একগাদা পয়সা খরচ হয়ে গেল? তাছাড়া—'

বুকু এত তাড়াতাড়ি কথা বলবে, ধরলে কথা থামায় কে? যা বলবার সবই বলে নেয় সে। তবু ওর 'তা ছাড়া—' কে থামিয়ে দিয়ে ছেনুমাসি বলেন, 'বলো বাবা, প্রাণ ভরে বলো'— বলে গটগট করে চলে যান। পিছন পিছন বেণুমাসি আর ডাম্বল।

আর ওঁরা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকুর মা রণচণ্ডী মূর্তি নিয়ে শুরু করেন ছেলে ঠ্যাঙাতে। ঠ্যাঙান আর চেঁচান— 'বল শয়তান ছেলে, কেন ওরকম কথা বললি? বল, বল শিগগির। মেরে মেরে তোকে মেরেই ফেলব আজ। তবু চুপ করে আছিস? কেন ওসব বললি? যতক্ষণ না বলবি, মার থামাব না আমি। লক্ষ্মীছাড়া পাজি বাঁদর। লোকের সামনে আমার মুখে চুনকালি!'

গোলমাল শুনে বুকুর বাবা এসে হাজির— 'কী হলো কী? ছেলেটাকে বেধড়ক পিটোচ্ছ কেন?'

'পিটব না'! বুকুর মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'পিটিয়ে ওকে তক্তা করব আমি। জানো— ও কী করেছে আজ?'

একে একে ছেলের ভূতুড়ে বুদ্ধির কথা বলতে থাকেন মা আর শুনতে শুনতে বাবা রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। তখন তিনিও লেগে যান প্রহারে।

সত্যি, যে ছেলে মা-বাপকে এভাবে বাইরের লোকের কাছে অপদস্থ করে, তাকে মেরে তক্তা করে ফেললেই কি রাগ মেটে?

দুজনে মিলে চেঁচান, 'বল, বল কেন ওসব বললি?' বুকু অনেকক্ষণ গোঁ ধরে চুপ করে মার খাচ্ছিল; আর পারে না। ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, 'নিজেই তো দুপুরবেলা একশোবার করে বললে— সবসময়ে সত্যি কথা বলবি, কারো কাছে কিছু লকোবি না; এখন আবার নিজেই মারছ? কী করে বুঝব, আসলে কী করতে হবে?'

হাতেকলমে

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯—১৯৯৫) : অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখিকা। জন্ম কলকাতায়। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ঘটেনি। অথচ অসামান্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা ও পরিচিত সমাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্চর্য দক্ষতায় তার গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প এবং ছোটোদের জন্য অজস্র বই লিখেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা, অগ্নিপরীক্ষা, সাগর শুকায়ে যায়, শশীবাবুর সংসার, সোনার হরিণ* ইত্যাদি। তাঁর রচিত অন্তত ৬৩টি গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি *রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার,* একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্ এবং নানা সরকারি খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

১.১ আশাপূর্ণা দেবীর লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

১.২ আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য কোন কোন বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন?

২. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ বুকু কোথায় বসে খেলা করছিল?

২.২ রিকশা থেকে কারা নামলেন?

২.৩ ডাম্বল আলমারি ভেঙে কার বই নামিয়েছিল?

২.৪ বুকুর মা-র কী কেনা ছিল?

২.৫ বুকু আর বুকুর সেজো খুড়িমা অতিথিদের জন্যে কী কী খাবার নিয়ে আসে?

২.৬ বুকু কোন স্কুলে ভরতি হয়েছিল?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ বুকু খেলতে খেলতে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় কেন?

৩.২ 'সিঁড়ি ভেঙে আর উঠতে পারব না বাবা' - কারা একথা বলেছেন? তাঁরা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারবেন না কেন?

৩.৩ 'ও কী! কী কাণ্ড করেছ তুমি' — কে, কী কাণ্ড করেছে?

৩.৪ বুকু অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কেন?

৩.৫ ‘ছেলের কথা শুনেই বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত’ — ছেলের কথা শুনে বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত হলো কেন?

৩.৬ ডাম্বলকে ইস্কুলে ভরতি করা হয়নি কেন?

৩.৭ ‘কে জানে পাগলা-টাগলা হয়ে যাবে নাকি’ — কার সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়েছে? এমন সন্দেহের কারণ কী?

৩.৮ ‘দুজনে মিলে চেঁচান, ‘বল, বল কেন ওসব বললি?’ — বুকু কেন ওসব বলেছিল?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

৪.১ গল্পে বুকুর আচরণ তাঁর মাকে অতিথিদের সামনে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। বুকুর এই আচরণ কি তুমি সমর্থন করো? বুকু কেন অমন আচরণ অতিথিদের সামনে করেছিল?

৪.২ বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

৪.৩ ‘কী করে বুঝব, আসলে কী করতে হবে’ — গল্পে বুকু এই কথা বলেছিল। — আসলে কী করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?

৪.৪ গল্পে দুটি ছোটো ছেলের কথা পড়লে — বুকু আর ডাম্বল। দুজনের প্রকৃতিগত মিল বা অমিল নিজের ভাষায় লেখো।

৪.৫ গল্পটি পড়ে বুকুর প্রতি তোমার সমানুভূতির কথা ব্যক্ত করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

শব্দার্থ : বেজায় — অতিরিক্ত, খুব। বার দু-তিন — দুই-তিন বাব। ইত্যবসরে –এই সুযোগে। মোলায়েম — কোমল ও মসৃণ। ড্যাবড্যাব করে — চোখ বড়ো বড়ো করে। গমগম — গম্ভীর শব্দ অভ্যর্থনা — সাদর আপ্যায়ন। ফ্যালফেলিয়ে — অবাক হয়ে, হতবুদ্ধি হয়ে। মাথায় বজ্রাঘাত — আকস্মিক বিপদে পড়া। হাটে হাঁড়ি ভাঙা — সবার মাঝে গোপন কথা প্রকাশ। ফাঁস — প্রকাশ (এখানে) ব্যাকুল — অস্থির। গাদাগাদি — ঠাসাঠাসি, ঘেঁষাঘেঁষি। বিচ্ছু — অতি দুরন্ত। বেয়াড়া — বিশ্রী, বদ। আহামরি --- প্রশংসাসূচক বা বিদ্রূপসূচক ধ্বনি। প্রসন্ন — আনন্দিত। হাড়কেপ্পন — অতি কৃপণ, খুব কিপটে। যথেষ্ট — ইচ্ছামতো। ধাতস্থ — প্রকৃতিস্থ, শান্ত। আক্কেল গুড়ুম — হতভম্ব অবস্থা। খণ্ডায় — নিবারণ করে। অপ্রতিভ — অপ্রস্তুত, হতবুদ্ধি। চটেমটে লাল — অত্যন্ত রেগে। বিশ্বম্ভর মূর্তি — আভিধানিক অর্থে বিশ্বকে যিনি ধারণ করেন, পাঠ্যাংশে ভয়ানক রূপ অর্থে। বেধড়ক — অপরিমিত, প্রচুর। প্রহার --- মার। অপদস্থ --- অপমানিত, লাঞ্ছিত।

৫. একই অর্থযুক্ত শব্দ গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

সংবাদ, পুস্তক, সন্তুষ্ট, কোমল, আপ্যায়ন।

৬. নীচের শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

ইত্যবসরে, বজ্রাঘাত, ব্যাকুল, নিশ্চয়, রান্না, দুরন্ত, সন্দেশ।

৭. নীচের শব্দগুলির কোনটি বিশেষ্য এবং কোনটি বিশেষণ খুঁজে নিয়ে লেখো। এরপর বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ এবং বিশেষণগুলির বিশেষ্যের রূপ লেখো :

মন, শিক্ষা, অবস্থা, গম্ভীর, শাসন, শয়তান, লাল, সর্বনেশে, ঘর, সুন্দর, দুরন্ত, মুখ, কথা, হ্যাংলা।

৮. নীচের প্রতিটি উপসর্গ দিয়ে পাঁচটি করে নতুন শব্দ তৈরি করে লেখো:

অ, বি, বে, আ, প্র, অব

৯. সমোচ্চারিত/ প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লিখে আলাদা আলাদা বাক্য রচনা করো:

আসা	সোনা	হাড়
আশা	শোনা	হার
মার	মাস	জ্বালা
মাড়	মাষ	জালা

১০. এই গল্পে অজস্র শব্দদ্বৈত ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দগুলি গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো:

(দুটি শব্দ খুঁজে দেওয়া হলো)

খুকখুক, তোড়জোড়।

১১. নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক/পূরণবাচক শব্দ খুঁজে বার করো:

১১.১ মা তো সেই তিনতলার ছাতে।

১১.২ দুই বোনের দুই দু-গুণে চারটি চোখ কপালে উঠে গেছে।

১১.৩ সাত বছরের ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাত টাকা।

১১.৪ নিজেই তো দুপুরবেলা একশো বার করে বললে — সবসময় সত্যি কথা বলবি।

১২. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

১২.১ বুকু ছুটে ওপরে চলে যায়। (জটিল বাক্যে)

১২.২ ছেনুমাসি আর অন্যটির নাম বেণুমাসি। (সরল বাক্যে)

১২.৩ যত বড়ো হচ্ছে তত যেন যা-তা হয়ে যাচ্ছে। (যৌগিক বাক্যে)

১২.৪ ছেলের কথা শুনেই বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত। (জটিল বাক্যে)

১৩. পাকা, মাথা — এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্য লেখো।

পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি

জীবনানন্দ দাশ

পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি— রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে
স্বপনের— কোন গল্প, কী কাহিনি, কী স্বপ্ন যে বাঁধিয়াছে ঘর
আমার হৃদয়ে, আহা, কেউ তাহা জানেনাকো—কেবল প্রান্তর
জানে তাহা, আর ঐ প্রান্তরের শঙ্খচিল; তাহাদের কাছে
যেন এ-জনমে নয়— যেন ঢের যুগ ধরে কথা শিখিয়াছে
এ হৃদয়— স্বপ্নে যে-বেদনা আছে : শুষ্ক পাতা— শালিকের স্বর,
ভাঙা মঠ— নক্‌শাপেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির রৌদ্রের ভিতর
হলুদ পাতার মতো সরে যায়, জলসিড়িটির পাশে ঘাসে

শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন ছন্দহীন বুনো চালতার:
জলে তার মুখখানা দেখা যায়— ডিঙিও ভাসিছে কার জলে,
মালিক কোথাও নাই, কোনোদিন এই দিকে আসিবে না আর,
ঝাঁঝরা-ফোঁপরা, আহা, ডিঙিটিরে বেঁধে রেখে গিয়েছে হিজলে:
পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি— রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার
গন্ধ লেগে আছে, আহা, কেঁদে-কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে।

হাতেকলমে

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪): রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরাপালক* ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - *ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা* প্রভৃতি। তাঁর রচিত আখ্যানের মধ্যে রয়েছে — *মাল্যবান, সুতীর্থ, জলপাইহাটি* প্রভৃতি পাঠ্য কবিতাটি তাঁর ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

১.১ জীবনানন্দ দাশের লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তাঁর লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ ‘দু-পহর’ শব্দের অর্থ কী?

২.২ ‘কেবল প্রান্তর জানে তাহা’ — ‘প্রান্তর’ কী জানে?

২.৩ ‘তাহাদের কাছে যেন এ জনমে নয় — যেন ঢের যুগ ধরে কথা শিখিয়াছে এ হৃদয়’ — কাদের কথা এখানে বলা হয়েছে?

২.৪ ‘জলসিড়িটির পাশে ঘাসে ...’ — কী দেখা যায়?

২.৫ ‘জলে তার মুখখানা দেখা যায়...’ — জলে কার মুখ দেখা যায়?

২.৬ ‘ডিঙিও ভাসিছে কার জলে...’ — ডিঙিটি কেমন?

২.৭ ডিঙিটি কোথায় বাঁধা রয়েছে?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ পাড়াগাঁয়ের দ্বিপ্রহরকে কবি ভালোবাসেন কেন?

৩.২ ‘স্বপ্নে যে-বেদনা আছে’ — কবির স্বপ্নে কেন বেদনার অনুভূতি?

৩.৩ প্রকৃতির কেমন ছবি কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

৩.৪ ‘কেঁদে কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে’ — কবির এমন মনে হওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৪.১ পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি ... শীর্ষক কবিতাটি ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের কতসংখ্যক কবিতা? ‘পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি’ কবিতায় কবি জীবনানন্দের কবি-মানসিকতার পরিচয় কীভাবে ধরা দিয়েছে, তা বুঝিয়ে দাও।

৪.২ কবিতাটির গঠন-প্রকৌশল আলোচনা করো।

৪.৩ ‘গন্ধ লেগে আছে রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার’ — কবিতায় কীভাবে এই অপরূপ বিষণ্নতার স্পর্শ এসে লেগেছে, তা যথাযথ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা করো।

শব্দার্থ: দু-পহর --- দ্বিপ্রহর। ঝাঁঝরা-ফোঁপরা — জীর্ণ,ফাঁপা বা শূন্য। জলসিড়ি--- বাংলাদেশের একটি নদী।

৫. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো:

পাড়াগাঁ, দু-পহর, স্বপন, জনম, ভিজে।

৬. নীচের শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

শঙ্খচিল, নক্‌শাপেড়ে, ছন্দহীন

৭. নীচের বাক্যগুলিতে ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :

৭.১ পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি—

৭.২ রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে স্বপনের—

৭.৩ শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন ছন্দহীন বুনো চালতার :

৭.৪ ডিঙিও ভাসিছে কার জলে, ...

৭.৫ কোনোদিন এইদিকে আসিবে না আর, ...

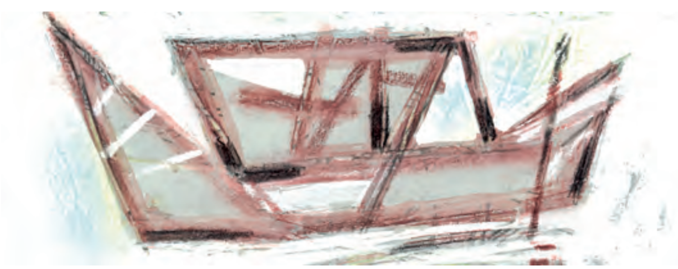

আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে

বিজয় সরকার

আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে এল, এল রে
এল আমার দুরন্ত শ্রাবণ।
আমার এমনি দিনে মনের কূলে লেগেছে ভাঙন, এল রে
এল আমার ঘরভাঙা শ্রাবণ॥

চূর্ণি নদীর ঘূর্ণিপাকে যেথা পড়ল চর
সেই চরেতে বেঁধেছিলাম বসতি এক ঘর
আমার সে ঘর ভেসে গেল দিন কয়েক পর এসে এক প্লাবন, এল রে
এল আমার দুরন্ত শ্রাবণ॥

ছায়াভিটে হিজলগাছে জলপরি কন্যা
উদাস চোখে চেয়ে দেখে শ্রাবণের বন্যা
আমি কাঁদি তাহার কান্না তার কি নাই কাঁদন, এল রে
এল আমার ঘরভাঙা শ্রাবণ॥

মেঠো আগুন নেভে রে জলের ছিটে লেগে
রাবণের চিতা নেভে না বন্ধু, শ্রাবণের মেঘে
ওসে আগুন জ্বলে দ্বিগুণ বেগে দুঃসহ দাহন, এল রে
এল আমার দুরন্ত শ্রাবণ॥

শ্রাবণ আবার আসিল ফিরে একটি বছর পর
ফিরে আসার আশা নাই রে বানে ভাসা ঘর
পাগল বিজয় বলে এমনই তোর বিধাতার বাধন, এল রে
এল আমার ঘরভাঙা শ্রাবণ॥

বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫) : বিখ্যাত কবিয়াল, গীতিকার, সুরকার এবং বাউল-ফকিরি গানের গায়ক। দুই বাংলায় তাঁর গানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপরিসীম। বর্তমান গানটি বাংলাদেশ লালন একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ‘স্বকণ্ঠে বিজয়’ অ্যালবাম থেকে নেওয়া হয়েছে।

নাটোরের কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ সকালে মনে পড়ল একটি গল্প — সেই প্রথম স্বদেশি যুগের সময়কার, কী করে আমরা বাংলা ভাষার প্রচলন করলুম।

ভূমিকম্পের বছর সেটা। প্রভিনসিয়াল কনফারেন্স হবে নাটোরে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন রিসেপসন কমিটির প্রেসিডেন্ট। আমরা তাঁকে শুধু 'নাটোর' বলেই সম্ভাষণ করতুম। নাটোর নেমন্তন্ন করলেন আমাদের বাড়ির সবাইকে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে তাঁর ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আমাদের কাউকে ছাড়বেন না — দীপুদা, আমরা বাড়ির অন্য সব ছেলেরা সবাই তৈরি হলুম, রবিকাকা তো ছিলেনই। আরো অনেক নেতারা, ন্যাশনাল কংগ্রেসের চাঁইরাও গিয়েছিলেন। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল, ডব্‌লিউ. সি. বোনার্জি, মেজোজ্যাঠামশায়, লালমোহন ঘোষ — প্রকাণ্ড বক্তা তিনি, বড়ো ভালো লোক ছিলেন, আর কী সুন্দর বলতে পারতেন। কিন্তু ঝোঁক ওই ইংরেজিতে — সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে, আরো অনেকে ছিলেন — সবার নাম কি মনে আসছে এখন।

তৈরি তো হলুম সবাই যাবার জন্য। ভাবছি যাওয়া-আসা হাঙ্গাম বড়ো। নাটোর বললেন, কিছু ভাবতে হবে না দাদা।

ব্যবস্থা হয়ে গেল, এখান থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে আমাদের জন্য। রওনা হলুম সবাই মিলে হৈ-হৈ করতে করতে। চোগাচাপকান পরেই তৈরি হলুম, তখনো বাইরে ধুতি পরে চলাফেরা অভ্যেস হয়নি। ধুতি-পাঞ্জাবি সঙ্গে নিয়েছি, নাটোরে পৌঁছেই এ-সব খুলে ধুতি পরব।

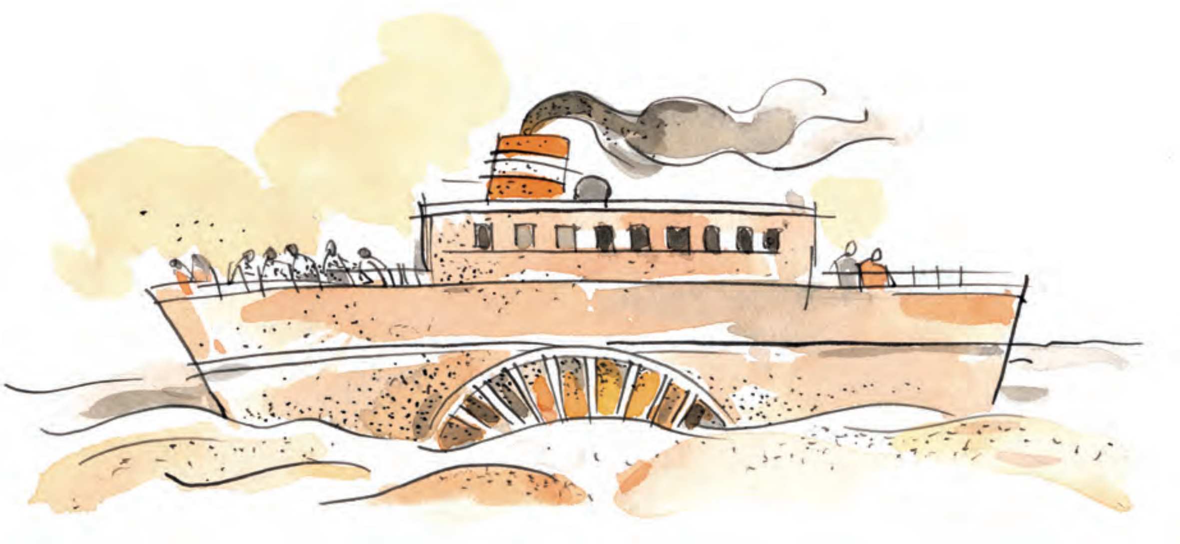

আমরা যুবকরা ছিলুম একদল, মহাফুর্তিতে ট্রেনে চড়েছি। নাটোরের ব্যবস্থা — রাস্তায় খাওয়াদাওয়ার কী আয়োজন। কিছুটি ভাবতে হচ্ছে না, স্টেশনে স্টেশনে খোঁজখবর নেওয়া, তদারক করা, কিছুই বাদ যাচ্ছে না — মহা আরামে যাচ্ছি। সারাঘাট তো পৌঁছানো গেল। সেখানেও নাটোরের চমৎকার ব্যবস্থা। কিছু ভাববারও নেই, কিছু করবারও নেই, সোজা স্টিমারে উঠে যাওয়া।

সঙ্গের মোটঘাট, বিছানা-কম্বল?

নাটোর বললেন, কিছু ভেবো না। সব ঠিক আছে।

আমি বললুম, আরে, ভাবব না তো কী। ওতে যে ধুতি-পাঞ্জাবি সবকিছুই আছে।

নাটোর বললেন, আমাদের লোকজন আছে, তারা সব ব্যবস্থা করবে।

দেখি নাটোরের লোকজনেরা বিছানাবাক্স মোটঘাট সব তুলছে, আর আমার কথা শুনে মিটিমিটি হাসছে। যাক, কিছুই যখন করবার নেই, সোজা ঝাড়া হাত-পায় স্টিমারে নির্ভাবনায় উঠে গেলুম। পদ্মা দেখে মহা খুশি আমরা, ফুর্তি আর ধরে না। খাবার সময় হলো, ডেকের উপর টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে খাবার জায়গা করা হলো। খেতে বসেছি সবাই একটা লম্বা টেবিলে। টেবিলের একদিকে হোমরাচোমরা চাঁইরা, আর একদিকে আমরা ছোকরারা, দীপুদা আমার পাশে। খাওয়া শুরু হলো, 'বয়'রা খাবার নিয়ে আগে যাচ্ছে ওইপাশে,

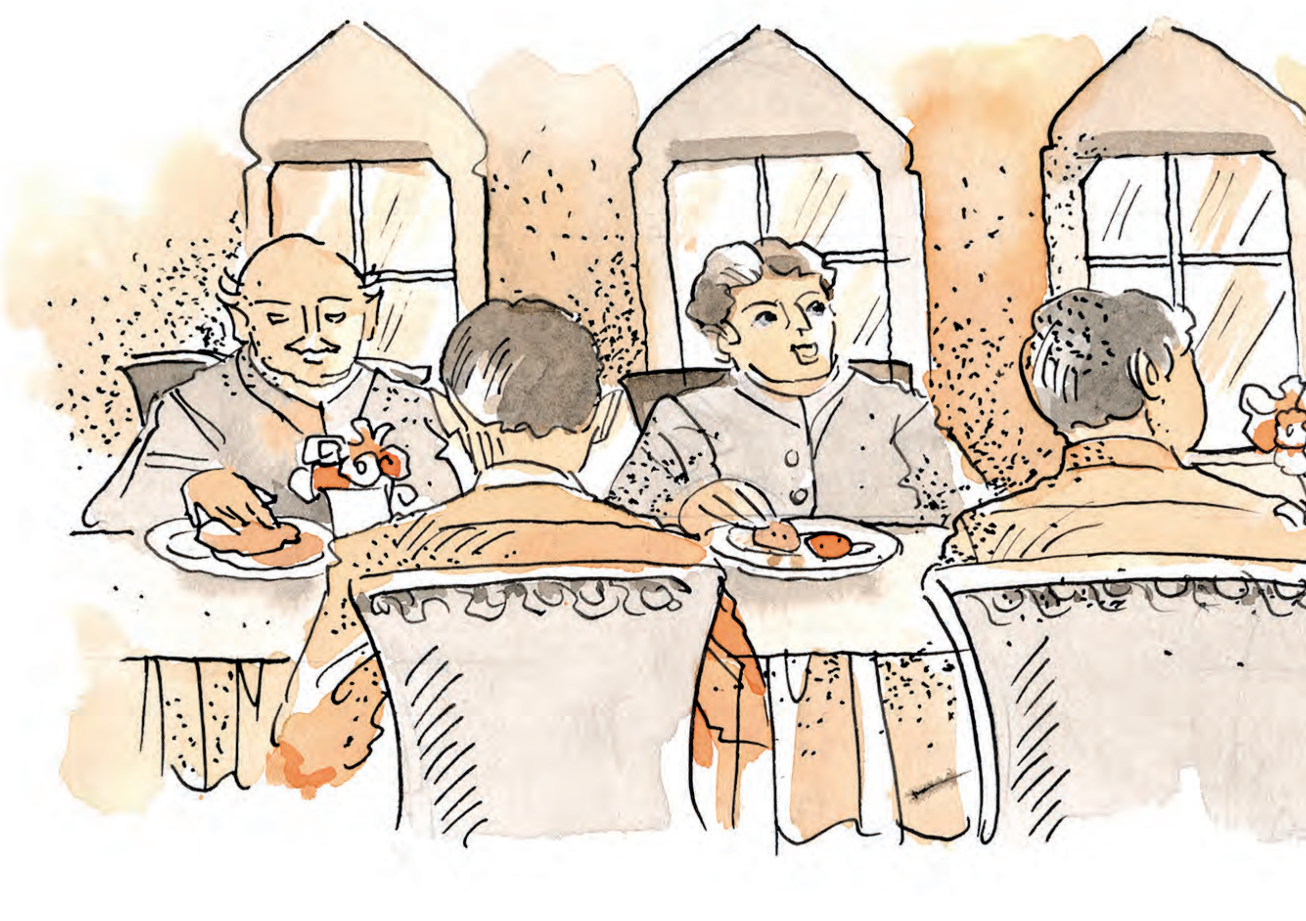

চাঁইদের দিকে, ওদের দিয়ে তবে তো আমাদের দিকে ঘুরে আসবে। মাঝখানে বসেছিলেন একটি চাঁই ; তাঁর কাছে এলে খাবারের ডিশ প্রায় শেষ হয়ে যায়। কাটলেট এল তো সেই চাঁই ছ-সাতখানা একবারেই তুলে নিলেন। আমাদের দিকে যখন আসে তখন আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না; কিছু বলতেও পারিনে। পুডিং এল; দীপুদা বললেন, অবন, পুডিং এসেছে, খাওয়া যাবে বেশ করে। দীপুদা ছিলেন খাইয়ে, আমিও ছিলুম খাইয়ে। পুডিং-হাতে বয় টেবিলের একপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে যেই সেই চাঁইয়ের কাছে এসেছে, দেখি তিনি অর্ধেকের বেশি নিজের প্লেটে তুলে নিলেন। ওমা, দীপুদা আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম। দীপুদা বললেন, হলো আমাদের আর পুডিং খাওয়া!

সত্যি বাপু, অমন ‘জাইগ্যানটিক’ খাওয়া আমরা কেউ কখনও দেখিনি। ওইরকম খেয়ে খেয়েই শরীরখানা ঠিক রেখেছিলেন ভদ্রলোক। বেশ শরীরটা ছিল তাঁর বলতেই হবে। দীপুদা শেষটায় বয়কে টিপে দিলেন, খাবারটা আগে যেন আমাদের দিকেই আনে। তারপর থেকে দেখতুম, দুটো করে ডিশে খাবার আসত। একটা বয় ওদিকে খাবার দিতে থাকত আর-একটা এদিকে। চোখে দেখে না খেতে পাওয়ার জন্য আর আপশোশ করতে হয়নি আমাদের।

নাটোর তো পৌঁছানো গেল। এলাহি ব্যাপার সব। কী সুন্দর সাজিয়েছে বাড়ি, বৈঠকখানা। ঝাড়লণ্ঠন, তাকিয়া, ভালো ভালো দামি ফুলদানি, কার্পেট, সে সবের তুলনা নেই — যেন ইন্দ্রপুরী। কী আন্তরিক, আদরযত্ন,

কী সমারোহ, কী তার সব ব্যবস্থা। একেই বলে রাজসমাদর। সবকিছু তৈরি হাতের কাছে। চাকর-বাকরকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক করে রাখা হয়েছিল, না চাইতেই সব জিনিস কাছে এনে দেয়। ধুতি-চাদরও দেখি আমাদের জন্য পাট-করা সব তৈরি, বাক্স আর খুলতেই হলো না। তখন বুঝলুম, মোটঘাটের জন্য আমাদের ব্যগ্রতা দেখে ওখানকার লোকগুলি কেন হেসেছিল।

নাটোর বললেন, কোথায় স্নান করবে অবনদা, পুকুরে?

আমি বললুম, না দাদা, সাঁতার-টাতার জানিনে, শেষটায় ডুবে মরব। তার উপর যে ঠান্ডা জল আমি ঘরেই চান করব। চানটান সেরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেশ ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। আমরা ছোকরার দল, আমাদের তেমন কোনো কাজকর্ম ছিল না। রবিকাকাদের কথা আলাদা। খাওয়া-দাওয়া, ধুমধাম, গল্পগুজব— রবিকাকা ছিলেন — গানবাজনাও জমত খুব। নাটোরও ছিলেন গানবাজনার বিশেষ উৎসাহী। তিনিই ছিলেন রিসেপশন কমিটির প্রেসিডেন্ট। কাজেই তিনি সব ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে খবরাখবর করতেন; মজার কিছু ঘটনা থাকলে আমাদের ক্যাম্পে এসে খবরটাও দিয়ে যেতেন। খুব জমেছিল আমাদের। রাজসুখে আছি। ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে, তখনো চোখ খুলিনি, চাকর এসে হাতে গড়গড়ার নল গুজে দিলে। কে কখন তামাক খায়, কে দুপুরে এক বোতল সোডা, কে বিকেলে একটু ডাবের জল, সবকিছু নিখুঁতভাবে জেনে নিয়েছিল, —কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবার জো নেই। খাওয়া-দাওয়ার তো কথাই নেই। ভিতর থেকে রাণিমা নিজের হাতে পিঠে-পায়েস করে পাঠাচ্ছেন। তার উপরে নাটোরের ব্যবস্থায় মাছ-মাংস-ডিম কিছুই বাদ যায়নি, হালুইকর বসে গেছে বাড়িতেই, নানা-রকমের মিষ্টি করে দিচ্ছে এবেলা-ওবেলা।

আমি ঘুরে ঘুরে নাটোরের গ্রাম দেখতে লাগলুম — কোথায় কী পুরোনো বাড়ি-ঘর-মন্দির। সঙ্গে সঙ্গে স্কেচ করে যাচ্ছি। অনেক স্কেচ করেছি সেবারে, এখনো সেগুলি আমার কাছে আছে। চাঁইদেরও অনেক স্কেচ করেছি ; এখন সেগুলি দেখতে বেশ মজা লাগবে। নাটোরেরও খুব আগ্রহ, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন একেবারে অন্দরমহলে রানি ভবানীর ঘরে। সেখানে বেশ সুন্দর সুন্দর ইটের উপর নানা কাজ করা। ওঁর রাজত্বে যেখানে যা দেখবার জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। আর আমি স্কেচ করে নিচ্ছি, নাটোর তো খুব খুশি। প্রায়ই এটা ওটা স্কেচ করে দেবার জন্য ফরমাশও করতে লাগলেন। তাছাড়া আরো কতরকমের খেয়াল — শুধু আমি নয়, দলের যে যা খেয়াল করছে, নাটোর তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করছেন। ফুর্তির চোটে আমার সব অদ্ভুত খেয়াল মাথায় আসত। একদিন খেতে খেতে বললুম, কী সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন নাটোর, টেবিলে আনতে আনতে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। গরম গরম সন্দেশ খাওয়ান দেখি। বেশ গরম গরম চায়ের সঙ্গে গরম গরম সন্দেশ খাওয়া যাবে। শুনে টেবিলসুদ্ধ সবার হো-হো করে হাসি। তক্ষুণি হুকুম হলো, খাবার ঘরের দরজার সামনেই হালুইকর বসে গেল। গরম গরম সন্দেশ তৈরি করে দেবে ঠিক খাবার সময়ে।

রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স বসল। গোল হয়ে সবাই বসেছি। মেজোজ্যাঠামশায় প্রিসাইড করবেন। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল রিপোর্ট লিখছেন আর কলম ঝাড়ছেন; তাঁর পাশে বসেছিলেন নাটোরের ছোটো তরফের রাজা, মাথায় জরির তাজ, ঢাকাই মসলিনের চাপকান পরে। ন-পিসেমশাই কালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাঁর সেই সাজ কালো বুটিদার করে দিলেন।

আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিকাকা প্রস্তাব করলেন প্রভিনসিয়াল কনফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে। আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে; আমরা বললুম, নিশ্চয়ই, প্রভিনসিয়াল কনফারেন্সে বাংলা ভাষার স্থান

হওয়া চাই। রবিকাকাকে বললুম, ছেড়ো না, আমরা শেষপর্যন্ত লড়ব এজন্য। সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সঙ্গে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না, ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় তেমনি এখানেও হবে সব-কিছু ইংরেজিতে। অনেক তক্কাতক্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাংলাতে, একদল বলবে ইংরেজিতে। সবাই মিলে গেলুম প্যান্ডেলে। বসেছি সব, কনফারেন্স আরম্ভ হবে। রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজিতে হতে পারে না, বাংলা গানই হলো। 'সোনার বাংলা' গানটা বোধহয় সেই সময়ে গাওয়া হয়েছিল—রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।

এখন, প্রেসিডেন্ট উঠেছেন স্পিচ দিতে ; ইংরেজিতে যেই-না মুখ খোলা আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম বাংলা ভাষার দলে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম — বাংলা, বাংলা। মুখ আর খুলতেই দিই না কাউকে। ইংরেজিতে কথা আরম্ভ করলেই আমরা চেঁচাতে থাকি — বাংলা, বাংলা। মহা মুশকিল, কেউ আর কিছু বলতে পারেন না। তবুও ওই চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। লালমোহন ঘোষ ছিলেন ঘোরতর ইংরেজিদুরস্ত, তাঁর মতো ইংরেজিতে কেউ বলতে পারত না, তিনি ছিলেন পার্লামেন্টারি বক্তা — তিনি শেষটায় উঠে বাংলায় করলেন বক্তৃতা। কী সুন্দর তিনি বলেছিলেন। যেমন পারতেন তিনি ইংরেজিতে বলতে, তেমনি চমৎকার তিনি বাংলাতেও বক্তৃতা করলেন। আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমাদের তো জয়জয়কার। কনফারেন্সে বাংলা ভাষা চলিত হলো। সেই প্রথম আমরা পাবলিকলি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।

যাক, আমাদের তো জিত হলো; এবারে প্যান্ডেলের বাইরে এসে একটু চা খাওয়া যাক। বাড়িতে গিয়েই চা খাবার কথা, তবে ওখানেও চায়ের ব্যবস্থা কিছু ছিল। নাটোর বললেন, কিন্তু গরম গরম সন্দেশ আজ চায়ের সঙ্গে খাবার কথা আছে যে অবনদা। আমি বললুম, সে তো হবেই, এটা হলো উপরি-পাওনা, এখানে, একটু চা খেয়ে নিই তো আগে। এখনকার মতো তখন আমাদের খাও খাও বলতে হতো না। হাতের কাছে খাবার এলেই তলিয়ে দিতেম।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১) **:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ বা অবন ঠাকুর ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* অলঙ্করণ করেন। বিলাতি শিল্পীদের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। মুঘল ও প্রাচীন ভারতের মহিমা এবং ভারতীয় জীবনচিত্র ছিল তাঁর ছবির অন্যতম বিষয়। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলি বাঙালির অক্ষয় সম্পদ। বাংলাদেশের আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতকথা, রূপকথা তাঁর লেখায় নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। *রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, নালক, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, খাতাঞ্জির খাতা, আলোর ফুলকি, বুড়ো আংলা, ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, ভারতশিল্প, বাংলার ব্রত, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ* তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। পাঠ্যাংশটি তাঁর *ঘরোয়া* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কোন সম্পর্কে সম্পর্কিত?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ 'আজ সকালে মনে পড়ল একটি গল্প' — লেখকের অনুসরণে সেই 'গল্প'টি নিজের ভাষায় বিবৃত করো।

২.২ লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী, তখনকার নাটোরের মহারাজার নাম কী ছিল?

২.৩ তিনি কোন 'রিসেপশন কমিটি'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন?

২.৪ 'নাটোর নেমন্তন্ন করলেন... ' — সেই নেমন্তন্নের তালিকায় কাদের নাম ছিল বলে লেখক স্মরণ করতে পেরেছেন?

২.৫ 'রওনা হলুম সবাই মিলে হৈ হৈ করতে করতে।'
— কোথায় রওনা হলেন? কীভাবেই বা রওনা হলেন?

২.৬ সরাঘাট থেকে লেখক ও তাঁর সঙ্গীরা কোন নদীতে স্টিমার চড়েছিলেন?

২.৭ স্টিমারে খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গ আলোচনায় লেখকের সরস মনের পরিচয় কীভাবে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে তা বুঝিয়ে দাও।

২.৮ 'যেন ইন্দ্রপুরী।' — কীসের সঙ্গে 'ইন্দ্রপুরী'র তুলনা করা হয়েছে? কেনই বা লেখক এমন তুলনা করেছেন?

২.৯ 'একেই বলে রাজ সমাদর।' — উদ্ধৃতিটির আলোকে নাটোরের মহারাজার অতিথি-বাৎসল্যের পরিচয় দাও।

২.১০ 'নাটোরের খুব আগ্রহ' — কোন প্রসঙ্গে তাঁর আগ্রহের কথা এখানে বলা হয়েছে?

২.১১ 'আগে থেকেই ঠিক ছিল' — আগে থেকে কী ঠিক থাকার কথা বলা হয়েছে? সেই উপলক্ষ্যে কোন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কথা পাঠ্যাংশে রয়েছে, তা আলোচনা করো।

২.১২ নাটোরে প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গানটি পরিবেশন করেছিলেন?

২.১৩ 'আমাদের তো জয়জয়কার।' — কী কারণে লেখক ও তাঁর সঙ্গীদের 'জয়জয়কার' হলো?

২.১৪ 'সেই প্রথম আমরা পাবলিকলি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।' — লেখকের অনুসরণে সেই 'লড়াই'-এর বিশদ বিবরণ দাও।

৩. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৩.১ আজ সকালে মনে পড়ল একটি গল্প — সেই প্রথম স্বদেশি যুগের সময়কার, কী করে আমার বাংলা ভাষার প্রচলন করলুম। (জটিল বাক্যে)

৩.২ ভূমিকম্পের বছর সেটা। প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স হবে নাটোরে। (বাক্যদুটিকে জুড়ে লেখো)

৩.৩ নাটোর নেমন্তন্ন করলেন আমাদের বাড়ির সবাইকে। (যৌগিক বাক্যে)

৩.৪ আরো অনেকে ছিলেন — সবার নাম কি মনে আসছে এখন। (না-সূচক বাক্যে)

৩.৫ নাটোর বললেন, কিছু ভেবো না। সব ঠিক আছে। (পরোক্ষ উক্তিতে)

৩.৬ অমন 'জাইগ্যানটিক' খাওয়া আমরা কেউ কখনো দেখিনি। (নিম্নরেখ শব্দটির পরিবর্তে বাংলা শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটি আবার লেখো।)

৩.৭ ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৩.৮ ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল রিপোর্ট লিখছেন আর কলম ঝাড়ছেন। (বাক্যটিকে দু'টি বাক্যে ভেঙে লেখো)

৩.৯ গরম গরম সন্দেশ আজ চায়ের সঙ্গে খাবার কথা আছে যে অবনদা। (নিম্নরেখ শব্দের প্রকার নির্দেশ করো এবং অর্থ এক রেখে অন্য শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটি আবার লেখো)

৩.১০ হাতের কাছে খাবার এলেই তলিয়ে দিতেম। (জটিল বাক্যে)

শব্দার্থ: চোগাচাপকান — লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ। জাইগ্যানটিক — দৈত্যাকৃতি। হোমরাচোমরা —সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিপ্রতিপত্তিযুক্ত। চাঁই —প্রধান, নেতা। স্পিচ — বক্তৃতা। প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স — প্রাদেশিক সম্মেলন।

৪. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সন্ধিবদ্ধ শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

৪.১ স্টিমারে নির্ভাবনায় উঠে গেলুম।

৪.২ তিনি অর্ধেকের বেশি নিজের প্লেটে তুলে নিলেন।

৫. **নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :**

হাঙ্গাম, আপসোস, চান, তক্কাতক্কি, জিজ্ঞেস

৬. **নীচের শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ করো :**

স্বদেশি, জিজ্ঞাসা, ঢাকাই

৭. **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :**

চোগাচাপকান, বিছানাবাক্স, ইন্দ্রপুরী, রাজসমাদর, গল্প-গুজব, অন্দরমহল

৯. **কোনটি কী ধরনের সর্বনাম তা লেখো:**

আমরা, সেটা, তাঁকে, সবাই, তিনি, আমি, এটা

মিলিয়ে পড়ো

স্বাদেশিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

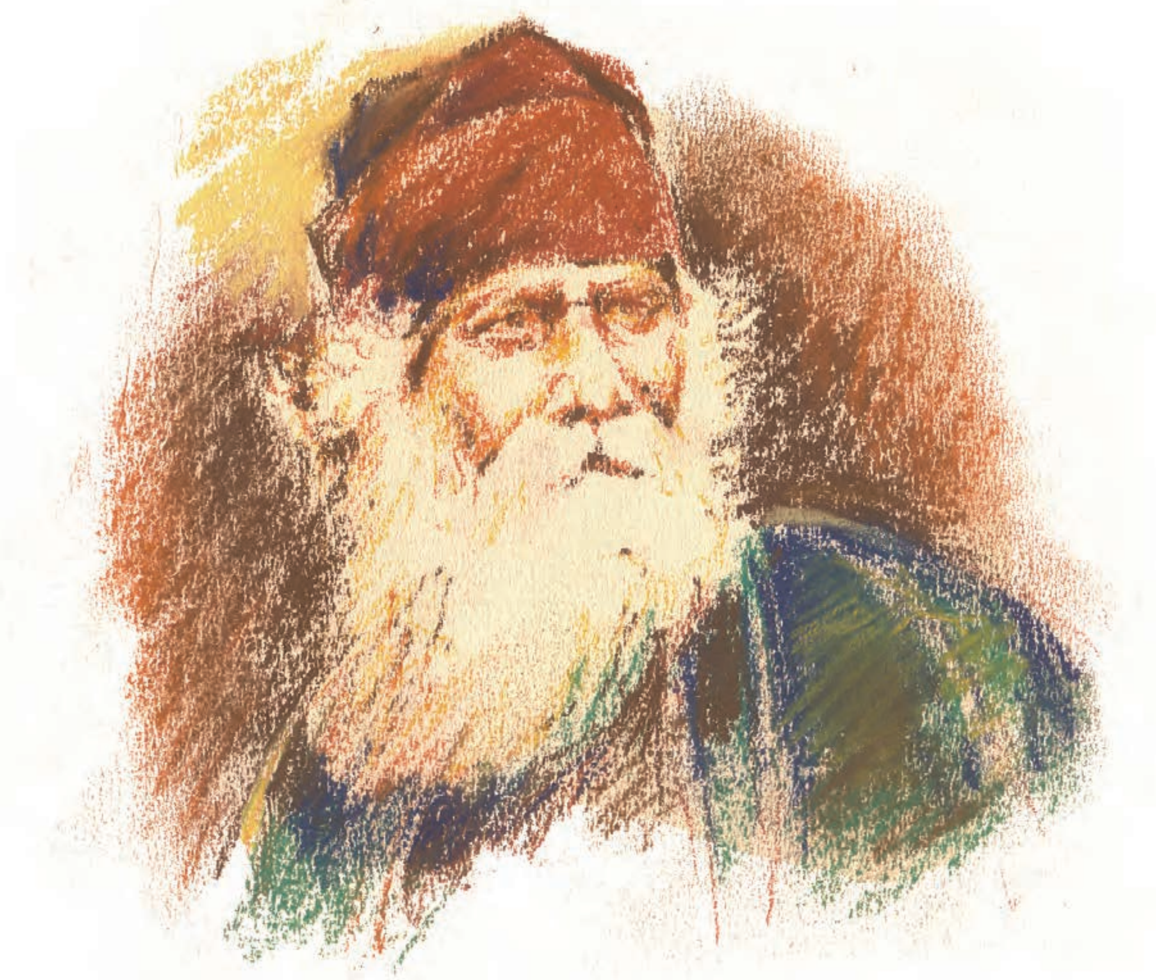

জ্যোতিদাদার* উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু** ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের বুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋকমন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

** রাজনারায়ণ বসু

মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভার আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও-বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহা নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপোস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ-মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।

(অংশ)

গড়াই নদীর তীরে

জসীমউদ্দীন

গড়াই নদীর তীরে,
কুটিরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যা সকালে ফুটি,
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।
মাচানের পরে সিম-লতা আর লাউ-কুমড়ার ঝাড়,
আড়া-আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল ফুল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়িখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ির বধূ কেউ।
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হতে ছোটো ছোটো ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে।
গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে,
এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে।
মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালিজিরা আর ধনে,
লংকা-মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।
লংকার রং, মসুরের রং মটরের রং আর,
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার!
যেন একখানি সুখের কাহিনি নানান আখরে ভরি,
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি।
সাঁঝ-সকালের রঙিন মেঘেরা এখানে বেড়াতে এসে,
কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালোবেসে।

হা তে ক ল মে

জসীমউদ্দীন (১৯০৪—১৯৭৬) : পল্লিকবি হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ এই কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে। *নক্সীকাঁথার মাঠ*, *রাখালী*, *বালুচর*, *ধানক্ষেত*, *সোজনবাদিয়ার ঘাট* তাঁর অমর সৃষ্টি। *বেদের মেয়ে* শীর্ষক গীতিনাট্য, *চলে মুসাফির* নামক ভ্রমণ কাহিনি ও *ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়* গ্রন্থরচনায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভার অনন্যতা ধরা পড়েছে। পাঠ্যাংশটি তাঁর *সোজনবাদিয়ার ঘাট* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ কবি জসীমউদ্দীন কোন অভিধায় অভিহিত?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ কবিতায় বর্ণিত নদীটির নাম কী?

২.২ মাচানের 'পরে কী আছে?

২.৩ মানুষের বসত করার কথা এখানে কারা বোঝেনি?

২.৪ উঠানেতে কী কী শুকাচ্ছে?

২.৫ বাড়িটিকে ভালবেসে কারা বেড়াতে এলে কিছুক্ষণ থেমে রয়?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ 'কুটীরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে'— এখানে কুটিরটিকে লতাপাতা-ফুলের মায়া দিয়ে ঘিরে রাখা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৩.২ ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে'— 'ডাহুক মেয়ে' কারা? তারা কাদের নিয়ে আসে? তারা কীভাবে কথা বলে?

৩.৩ 'যেন একখানি সুখের কাহিনি নানান আখরে ভরি'— 'আখর' শব্দটির অর্থ কী? সুখের কাহিনির যে নানা ছবি কবি এঁকেছেন তার মধ্যে কোনটি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এবং কেন?

৩.৪ 'কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালোবেসে'— রঙিন মেঘেরা বাড়িটিকে ভালোবেসে থেমে থাকে। এর মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ 'এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি'— কবিতায় কবি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম যে গ্রামীণ কুটিরের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন তার বিবরণ দাও।

৪.২ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কবিতায় কবি পরম মমতায় গ্রামীণ কুটিরের ছবি এঁকেছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের বাড়ির সঙ্গে এমন একটি মমতাময় সম্পর্ক আছে। তুমি তোমার বাড়ির বিভিন্ন অনুষঙ্গের বিবরণ দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

শব্দার্থ: মাচান — বাঁশ ইত্যাদির তৈরি উঁচু বেদি বা মঞ্চ। এঁদো ডোবা — নোংরা ও পঙ্কিল জলাশয়। হেথায় — এখানে। আখরে —অক্ষরে, বর্ণে।

৫. নীচের বাক্যগুলি থেকে ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো :

৫.১ কুটিরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।

৫.২ উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।

৫.৩ লংকা-মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।

৫.৪ জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার!

৫.৫ কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালোবেসে।

৬. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

৬.১ লাল শাড়িখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ির বধূ কেউ। (জটিল বাক্যে)

৬.২ ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে। (চলিত গদ্যে)

৬.৩ গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে (না-সূচক বাক্যে)

৬.৪ এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে। (যৌগিক বাক্যে)

৭. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

কুমড়া, কালিজিরা, উঠান, সযতনে, আখর, সাঁঝ

৮. কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :

৮.১ গড়াই নদীর <u>তীরে</u>

৮.২ উঠানের কোণে <u>বুনো ফুলগুলি</u> হেসে হয় কুটি কুটি

৮.৩ গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে <u>গান</u> ধরে

৮.৪ যেন একখানি সুখের কাহিনি নানান <u>আখরে</u> ভরি

৮.৫ সাঁঝ-সকালের <u>রঙিন মেঘেরা</u> এখানে বেড়াতে এসে

৯. নীচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি কোন শ্রেণির বিশেষ্য তা নির্দেশ করো :

মানুষ —	ফুলগুলি —
আনন্দ —	আলপনা —

১০. নীচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি কোন শ্রেণির সর্বনাম তা নির্দেশ করো :

যার —	তাহারা —
কেউ —	তার —

১১. এঁদো, লাল, বুনো, রঙিন — বিশেষণগুলির সাহায্যে নতুন শব্দবন্ধ তৈরি করো।

জেলখানার চিঠি

সুভাষচন্দ্র বসু

মান্দালয় জেল
২। ৫। ২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪। ৩। ২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে, এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে 'double distillation'-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে, কিন্তু এবার তা হয়নি। সেজন্য খুবই খুশি হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমল ভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। এ চিঠিখানিকে যে আবার 'censor' -এর হাত অতিক্রম করে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা ; কেন না, এটা কেউ চায় না যে, তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত

আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবছি ও যা অনুভব করছি, তার অনেকখানিই কোনো এক ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি, সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। এ-কথা আমি বলতে পারি না যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি— কেন না, সেটা নিছক ভন্ডামি হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোনো ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরও হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ-প্রণালীর) আদর্শের অনুসরণ মাত্র। ... কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌স্-এর মতো উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন, সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যদি বলো একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থাা করা উচিত। প্রতিযেধমূলক দণ্ডবিধি— যেটা কারাশাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে — তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তাহলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের দেশের আর্টিস্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প এবং সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি, তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তাহলে দুঃখে কষ্টেআর কোনো যন্ত্রণা থাকত না এবং তাহাতেই তো আত্মা ও দেহের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে।

সাধারণত একটা দার্শনিক ভাব বন্দিদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই করে নিয়েছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার যতেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হলেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে; কিন্তু আমাদের কষ্টতো শুধু আধ্যাত্মিক নয় — সে যে শরীরের এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার আলোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দি হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি যে, আমাদে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রাকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অন্য কারণে না হলেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' বলে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' 'proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্তত আশা করি যে আছে) তাই নিজেকে Martyr বলে মনে করবার মত স্পর্ধা আমার নেই। স্পর্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিসটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom'জিনিসটা আমার কাছে বড়োজোর একটা আদর্শই হতে পারে।

আমার বিশ্বাস, বেশি দিনের মেয়াদের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্ধক্য এসে চেপে ধরে, সুতরাং এ-দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে আকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অকেকগুলি কারণই এর জন্য দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্তির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থাকা, একটার অধীনতার শৃঙ্খলভার, বন্ধুজনের অভাব এবং সংগীতের অভাব, যাহা সর্বশেষ উল্লিখিত হলেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি এভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকালবার্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্যে সংগীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিকনিক, বিশ্রম্ভালাপ, সংগীতচর্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলাধূলা করা, মনোমতো কাব্য সাহিত্যের চর্চা — এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে, আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর করে বন্দি করে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সমাজিক বিধিব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মতো নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়েই থাকবে।

এ-কথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধু-বান্ধবের এবং সর্বসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকেই প্রভাবটা নিতান্ত

অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ করে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোনো সান্ত্বনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ি ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের Yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে, সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়িতে কোনো সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে, সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতার লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির তো শেষ আছে। আমার বেশি উদ্যম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্যও আমার নেই।

আমাদের জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেই বন্দী-জীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই সমস্ত সূক্ষ্ম ধরনের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্তত এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন — এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ করে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কী কঠোর ও নিরানন্দময়।

তুমি বলেছ যে, মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটিকে একেবারে তলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে, — এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দু আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌঁছবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ কষ্টের ছোটোখাটো অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে তো দুঃসংবাদ বা নিরুৎসাহের কোনো কারণ দেখি না; বরং আমার মনে হয়, দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে করো, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোনো মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে এ-কথা বলা আনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি —

(ইংরাজি থেকে অনূদিত)

হাতেকলমে

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭—) **:** ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অতি জনপ্রিয় নেতা। ভারত বিদ্বেষী ইংরেজ অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের অভিযোগে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। প্রথম জীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। গৃহে অন্তরীণ থাকাকালীন ১৯৪১ সালে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে তিনি কাবুল হয়ে রাশিয়ায় পৌঁছান। পরে রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে *আজাদ হিন্দ ফৌজ*-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে *তরুণের স্বপ্ন, An Indian pilgrim* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১.১ সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন কেন?

১.২ রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে তিনি কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন?

২. **অনধিক তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ তোমার পাঠ্য পত্রখানি কে, কোথা থেকে, কাকে লিখেছিলেন?

২.২ কোন ব্যাপারটিকে পত্রলেখক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেছেন?

২.৩ বন্দিদশায় মানুষের মনে শক্তি সঞ্চারিত হয় কীভাবে?

২.৪ মান্দালয় জেল কোথায় অবস্থিত?

২.৫ ভারতীয় জেল বিষয়ে একটি পুস্তক সুভাষচন্দ্রের লেখা হয়ে ওঠেনি কেন?

২.৬ সুভাষচন্দ্র কেন দিলীপ রায়র প্রেরিত বইগুলি ফেরত পাঠাতে পারেননি?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো :**

৩.১ নেতাজি ভবিষ্যতের কোন্ কর্তব্যের কথা এই চিঠিতে বলেছেন? কেন এই কর্তব্য স্থির করেছেন? কারা-শাসন প্রণালী বিষয়ে কাদের পরিবর্তে কাদের প্রণালীকে তিনি অনুসরণযোগ্য বলে মনে করেছেন?

৩.২ 'সেজন্য খুবই খুশি হয়েছি।' — বক্তা কে? তিনি কীজন্য খুশি হয়েছেন?

৩.৩ 'আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন।' — কে, কাকে এ কথা বলেছেন? কীসের উত্তর দেবার কথা বলা হয়েছে?

৩.৪ 'পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যেজন ভুক্তভোগী।'— উদ্ধৃতির সমার্থক বাক্য পত্রটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো। সেই বাক্যটি থেকে লেখকের কোন মানসিকতার পরিচয় পাও?

৩.৫ ‘আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।’ — কোন প্রসঙ্গে বক্তার এই উক্তি? জেলজীবনে তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কীভাবে লাভবান হবার কথা বলেছেন?

৩.৬ ‘Martyrdom’ শব্দটির অর্থ কী? এই শব্দটি উল্লেখ করে বক্তা কী বক্তব্য রেখেছেন?

৩.৭ ‘যখন আমাদিগকে জোর করে বন্দি করে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়?’ — কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? ‘তাদের মূল্য’ বিষয়ে লেখকের বক্তব্য আলোচনা করো।

৩.৮. ‘মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কী কঠোর ও নিরানন্দময়।’ — যে ঘটনায় লেখকের মনে এই উপলব্ধি ঘটে তার পরিচয় দাও।

৩.৯ এই চিঠিতে কারাবন্দি অবস্থাতেও দুঃখকাতর, হতাশাগ্রস্ত নয়, বরং আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী নেতাজির পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। — পত্রটি অবলম্বনে নিজের ভাষায় মন্তব্যটির যাথার্থ্য পরিস্ফুট করো।

৩.১০ কারাগারে বসে নেতাজির যে ভাবনা , যে অনুভব, তার অনেকখানি কেন অকথিত রাখতে হবে?

৪. নীচের বাক্যগুলির তথ্যগত অশুদ্ধি সংশোধন করো :

৪.১ নেতাজি মনে করতেন না যে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে।

৪.২ কারাগারে বন্দি অবস্থায় নেতাজি সুভাষ গীতার আলোচনা লিখেছিলেন।

৪.৩ জেল জীবনের কষ্ট মানসিক অপেক্ষা দৈহিক বলে নেতাজি মনে করতেন।

৫. নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাসবদ্ধ পদ বেছে নিয়ে ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো :

৫.১ তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে কোমলভাবে স্পর্শ করেছে।

৫.২ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি।

৫.৩ তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে।

৫.৪ নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

৫.৫ লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার আলোচনা লেখেন।

শব্দার্থ:- আধ্যাত্মিক — অধ্যাত্ম বা আত্মা সম্বন্ধীয়, স্থৈর্য — স্থিরতা, আত্মম্ভরিতা — অহংকার, অবমাননা — অপমান /অনাদর, বাহ্য — বাহির, লীন — মিলিত/লুপ্ত।

৬. শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো :

পাঠক, দর্শন, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, ভণ্ডামি, সমৃদ্ধ, মহত্ত্ব, অভিজ্ঞতা।

৭. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৭.১ আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। (না-সূচক বাক্যে)

৭.২ সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায় (প্রশ্নবোধক বাক্যে)।

৭.৩ লজ্জায় তারা বাড়িতে কোন সংবাদ দেয়নি। (যৌগিক বাক্যে)

৭.৪ কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে। (সরল বাক্যে)

৭.৫ বিনা দুঃখ কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে? (নির্দেশক বাক্যে)

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৮.১ ‘শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, সংশোধনই হওয়া উচিত জেলের প্রকৃত উদ্দেশ্য।’ — তুমি কি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৮.২ ‘আমাদের দেশের আর্টিস্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো।’ — এ প্রসঙ্গে কারাজীবন যাপনকরা কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করো।

৮.৩ পত্রটি পড়ে কারাজীবন বিষয়ে তোমার যে ধারণা ও অনুভূতি জন্মেছে — তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

৮.৪ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে আরো জেনে ‘সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম’ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

স্বাধীনতা

ল্যাংস্টন হিউজ

স্বাধীনতা কোনোদিনই আসবে না,
না,
আজ নয়
কোনোদিনই নয়
ভয় অথবা সমঝোতার মধ্যে,
তার কারণ
আমাদেরও তো অন্য সকলের মতন
অধিকার রয়েছে ,
দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার,
দুকাঠা জমির মালিকানার,

শুনে শুনে কান পচে গেল,
'সময়ে
সবই হবে, কাল একটা নূতন দিন'—

মৃত্যুর পরে তো আমার কোনো
স্বাধীনতার প্রয়োজন হবে না,
আগামীকালের রুটি
দিয়ে কি আজ বাঁচা যায়,
স্বাধীনতা একটা শক্তিশালী বীজপ্রবাহ,
বাঁচার জন্য,
একটা বড়ো প্রয়োজনের জন্য,
আমিও তো সেখানেই বাস করি,
তুমি যেখানে,

তাই
স্বাধীনতা আমার প্রয়োজন
তোমার যেমন।

তরজমা : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহ

হাতে কলমে

ল্যাংস্টন হিউজ (১৯০২—১৯৬৭) : বিংশ শতকের কুড়ির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্লেম রেনেসাঁসের অন্যতম নেতা হিসেবে সমধিক পরিচিত। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সমাজকর্মী ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম *The Weavy Blues*। তাঁর রচিত অন্যান্য বই *Male Bone, Jerico-Jim Crow* প্রভৃতি। কাব্য স্রষ্টা হিসেবে তিনি বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

১.১ ল্যাংস্টন হিউজের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

১.২ তিনি কোন দেশের রেনেসাঁসের অন্যতম নেতা হিসাবে পরিচিত?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

২.১ স্বাধীনতা বলতে কী বোঝো? কী কী বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

২.২ মানুষ পরাধীন হয় কখন?

২.৩ পরাধীন মানুষের স্বাধীনতা পাওয়ার পথগুলি কী কী?

২.৪ 'স্বাধীনতা' কবিতাটির মধ্যে দুটি 'পক্ষ' আছে— 'আমি-পক্ষ' আর 'তুমি-পক্ষ'। এই 'আমি পক্ষ' আর 'তুমি-পক্ষ' — এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। এই ক্ষেত্রে 'সে পক্ষ' নেই কেন?

২.৫ 'সময়ে/সবই হবে, কাল একটা নূতন দিন'— কবিতার মধ্যে উদ্ধৃতিচিহ্নের ভিতরে থাকা কথাটি কার/কাদের কথা বলে তোমার মনে হয়? তারা এ ধরনের কথা বলেন কেন?

২.৬ 'আগামীকালের রুটি/ দিয়ে কি আজ বাঁচা যায়'— এখানে 'আগামীকাল' আর 'আজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

শব্দার্থ : সমঝোতা — আপোস। কাঠা — জমির পরিমাণ বিশেষ (প্রায় ৭২০ বর্গফুট)।

৩. **নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো :**

৩.১ মৃত্যুর পরে তো আমার .... প্রয়োজন হবে না।

৩.২ স্বাধীনতা একটা শক্তিশালী বীজপ্রবাহ।

৩.৩ আমাদেরও তো অন্য সকলের .... জমির মালিকানার।

৩.৪ স্বাধীনতা আমার প্রয়োজন/তোমার যেমন।

৪. **নীচের প্রতিটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো :**

স্বাধীনতা, দুকাঠা, আগামীকাল, বীজপ্রবাহ

৫. স্বাধীনতা নিয়ে লেখা আরো দুটো কবিতার উল্লেখ করো এবং এই কবিতার সঙ্গে তাদের তুলনামূলক আলোচনা করো।

আদাব

সমরেশ বসু

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল — চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চীৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী-গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিন্‌টা উল্টে এসে পড়েছে গলি দু'টোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হলো না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না। —'আল্লাহু-আকবর' কি 'বন্দেমাতরম্'।

হঠাৎ ডাস্টবিন্‌টা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুর্হূত কাটে। ...নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিন্‌টাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিন্‌টা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হলো। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা ... ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটি মাথা। মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর...। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনি। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল— হিন্দু, না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয় তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু, না মুসলমান?

—আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে। ...প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে,—বাড়ি কোন্‌খানে?

—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইডায়। তোমার?

---চাষাড়া---নারাইণগঞ্জের কাছে।...কী কাম করো?

—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি।—তুমি?

—নারাইণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে দু'জনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।...হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দুপক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

—ধারে-কাছেই য্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

—হ্, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল: আরে, না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ্ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল---বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাকো।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—ক্যান্?

—ক্যান্? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল—ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। —যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না। কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো, মানুষের মন বোঝো না?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হলো শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকারে গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলেমেয়েদের কথা... তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে...কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে দোকানে এত হাসাহাসি, কথাকওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কি অভিশপ্ত জাত! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিলো মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু'একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খস্‌খস্ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

—হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া। —আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

—আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু'একবার খস্‌খস্ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

—সোহান্ আল্লা! —নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।...ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা

ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

—তুমি... ?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু'জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্ করে উঠে দাঁড়াল। বলল—হ আমি মোছলমান। —কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু...
মাঝির বগলের পুঁটলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

—পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো?

—আর কিছু নাই তো ! —সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

—মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখো। পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

—আরে না না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন যায়— তুমিই কও?

হেই ত' হক্ কথাই। ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখ নাই তো?

—ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুঁইও নাই। পরানটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুর তার জামা কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

—আইচ্ছা...মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পারনি—এই মাই'র দ'ইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্মকণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ তো তোমাগো ওই লিগওয়ালোগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল—হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?

—আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে। —তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে। ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়ে হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেম্বায়? —নিস্ফল ক্রোধে মাঝি দু'হাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে জড়িয়ে ধরে।

—হ।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি ; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান্ হজরতের হাত, বখশিশ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে' দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দ যেন বড়ো রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

—কী করব? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

—চলো পলাই। কিন্তুক যামু কোন্দিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চলো যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না, —ওই ড্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

—হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এইদিকে।—

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চলো, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবার পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুট্‌ফুট্ করছে। দুইজনেই একবার থম্‌কে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড়-ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিমদিকে। খানিকটা এগিয়ে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভালবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল।

—কিনারে কিনারে চলো। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—খাড়াও। —মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

—কী হইল?

—এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

হেদিকে দেখো।

মাঝির সঙ্কেত মতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কী যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত মুখ নেড়ে। বারান্দার নীচে ঘোড়ার জিন্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে—ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে?

—তাই কইতাছি তুমি থাকো, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠ্যা বাড়িত যাইবা গা।

—আর তুমি?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।—আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

—আরে না না মিয়া করো কী? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।

—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না, ভাই ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ্, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ্ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিনব, বাপজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন্ করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমায় ধইরা ফেলায়?—ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখান থাইকা য্যান উইঠো না। যাই...ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। —আদাব।

—আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুক্‌ধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগমান্— মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিশ্বাসে। অনেকক্ষণ তা' হলো, মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করবে পরবে। বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?' —সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

—হলট্...

ধ্বক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চীৎকার করে।

—ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম, গুড়ুম। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলামইয়ার, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

হাতেকলমে

সমরেশ বসু (১৯২৪ — ১৯৮৮) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ছোটোগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্বে তিনি বিচিত্র পেশা অবলম্বন করে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ফেরিওয়ালা থেকে চটকলের শ্রমিক, বস্তির এঁদো ঘর থেকে সুরম্য দালান — সর্বত্রই ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে *বি টি রোডের ধারে, গঙ্গা, শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে, জগদ্দল , মহাকালের রথের ঘোড়া* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। *কালকূট* ছদ্মনামে তিনি অনেক ভ্রমণ কাহিনিও লিখেছেন।

১.১ সমরেশ বসুর ছদ্মনাম কী?

১.২ তাঁর লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ কোন সময়পর্বের কথা গল্পে রয়েছে?

২.২ ‘ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী’ — প্রাণীদুটির পরিচয় দাও?

২.৩ ‘ওইটার মধ্যে কী আছে?’ — বক্তা কীসের প্রতি ইঙ্গিত করে?

২.৪ গল্পে কোন নদীর প্রসঙ্গ রয়েছে?

২.৫ ‘সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল ...’ — তার এই হাসির কারণ কী?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো:**

৩.১ ‘শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে।’ — লেখকের অনুসরণে গল্পঘটনার রাতের দৃশ্য বর্ণনা করো।

৩.২ ‘হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল।’ — ‘ডাস্টবিন নড়ে ওঠা’র অব্যবহিত পরে কী দেখা গেল?

৩.৩ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবহ গল্পে কীভাবে রচিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

৩.৪ ‘মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো।’ — সেই রুদ্ধ উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলির ছবি গল্পে কীভাবে ধরা পড়েছে তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৩.৫ ‘এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে?’ — উদ্ধৃতিটির আলোকে সেই সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করো।

৪. **নিম্নলিখিত বাক্যগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো:**

৪.১ ‘রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।’

৪.২ ‘ডাস্টবিনের দুইপাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল।’

৪.৩ ‘স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।’

৪.৪ ‘অন্ধকারের মধ্যে দু জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়ো বড়ো হয়ে উঠল।’

৪.৫ ‘সুতো-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে।’

৪.৬ ‘ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা।’

শব্দার্থ : আন্দাইরা গলি — অন্ধকার গলি। অসবুর — অধৈর্য। সুঁই — সূঁচ। ভগবানের কিরা — ভগবানের দিব্য বা শপথ। রায়ট — দাঙ্গা। পোলামাইয়া — ছেলেমেয়ে। ছাওয়াল — ছেলে। দুশমন — শত্রু। তাগো — তাদের।

৫. নীচের বাক্যগুলি থেকে অব্যয় পদ খুঁজে নিয়ে কোনটি কোন শ্রেণির অব্যয় তা নির্দেশ করো:

৫.১ শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে।

৫.২ তারা গুলি ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

৫.৩ উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না।

৫.৪ তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না।

৫.৫ মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

৬. নীচের বাক্যগুলি থেকে সন্ধিবদ্ধ পদ খুঁজে নিয়ে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো:

৬.১ তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল।

৬.২ মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে।

৬.৩ নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ।

৬.৪ দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য।

৬.৫ সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

৭. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

চোরাগোপ্তা, পথনির্দেশ, নির্জীব, দীর্ঘনিশ্বাস, পোলামাইয়া।

৮. নিম্নরেখাঙ্কিত অংশের কারক-বিভক্তি নির্দেশ করো :

৮.১ দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়।

৮.২ সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।

৮.৩ নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

৮.৪ আমাগো কথা ভাবে কেডা?

৮.৫ মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ নিশ্বাসে।।

৯. নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন কোন নিয়ম কাজ করেছে লেখো :

হেইপারে, নারাইনগঞ্জ, ডাইকা, আঙুল, চান্দ।

১০. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

১০.১ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল। (জটিল বাক্যে)

১০.২ খানিকক্ষণ চুপচাপ। (না-সূচক বাক্যে)

১০.৩ পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

১০.৪ শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। (যৌগিক বাক্যে)

১০.৫ মাঝি বলল, চল যেদিক হউক। (পরোক্ষ উক্তিতে)

১১. ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :

১১.১ কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে।

১১.২ সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।

১১.৩ ধারে-কাছেই ষ্যান লাগছে।

১১.৪ অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

১১.৫ বাদামতলির ঘাটে কোন অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে —

১২. নীচের শব্দগুলির শ্রেণিবিভাগ করো :

মজুর, লীগওয়ালো, পুলিশ, নসিব, রাত্রি।

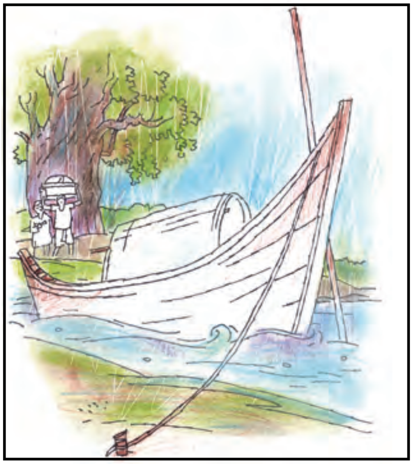

ভয় কি মরণে

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে॥
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব-দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে॥
সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দে-রে নিয়ো রে সঙ্গে॥

মুকুন্দদাস

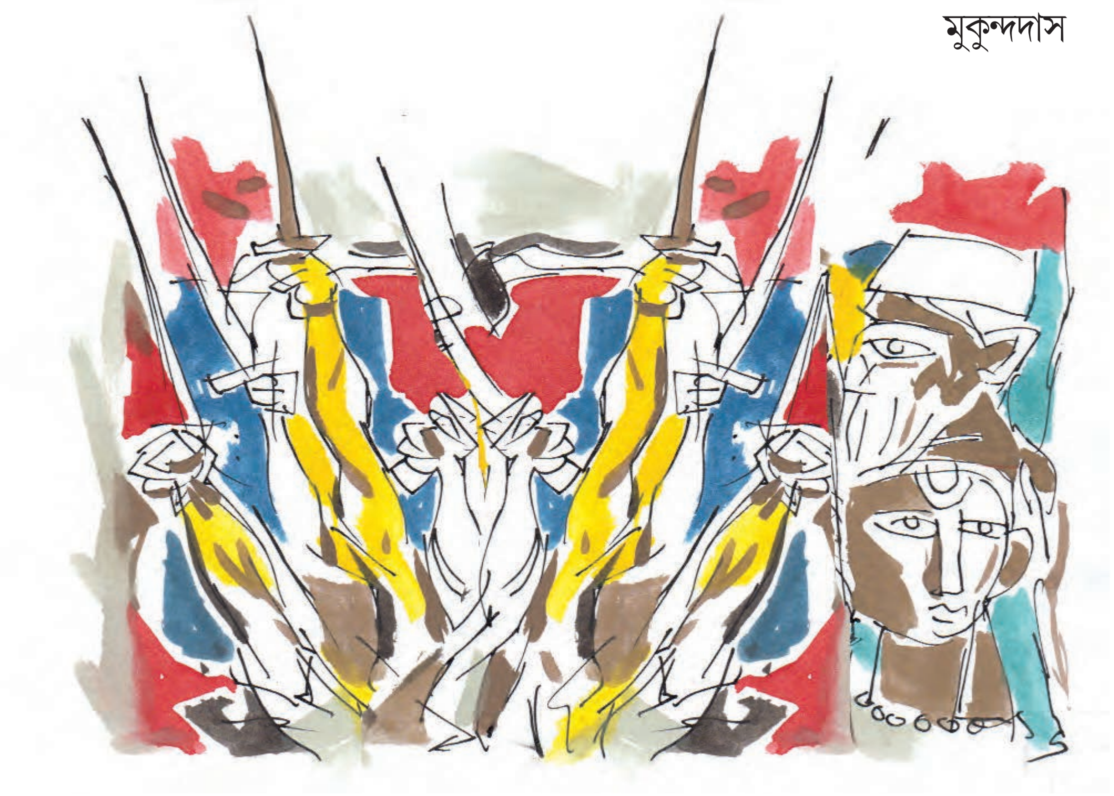

শিকল-পরার গান

কাজী নজরুল ইসলাম

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকলবাঁধা পা নয় এ শিকলভাঙা কল॥
তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস,
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস।
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আনব মাভৈঃ-বিজয়মন্ত্র বলহীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়;
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥

ওরে ক্রন্দন নয়, বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্জনা,
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

হাতেকলমে

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : বাংলা সাহিত্যে *বিদ্রোহী কবি* হিসাবে সমাদৃত। জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মানবতার কবি নজরুল ইংরেজের শোষণ, সামাজিক অসাম্য, ধর্মীয় ভন্ডামি এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্যকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে তিনি সদাসচেষ্ট। কবিতা এবং গদ্য ব্যতিরেকে নজরুল-প্রতিভা সার্থকতা লাভ করেছিল তাঁর গানে। তিনি শ্যামাসংগীত, গজল, দেশাত্মবোধক, ইসলামি প্রভৃতি নানা ধরনের গানেরও রচয়িতা। তাঁর লেখা বইগুলি হলো — *অগ্নিবীণা*, *বিষের বাঁশি*, *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*, *ফণীমনসা*, *প্রলয়শিখা* প্রভৃতি।

পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *বিষের বাঁশি* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

১.২ তিনি কী কী ধরনের গানের রচয়িতা?

শব্দার্থ : ক্রন্দন — কান্না। লাঞ্ছনা — নিগ্রহ , অপমান। চরণ — পা। বন্দনা — উপাসনা, আরাধনা। ঝঞ্ঝনা — ধাতব আওয়াজ। বন্ধনী — যা দিয়ে বাঁধা হয়। মাভৈঃ — ভয় নেই। অগ্রদূত — পথপ্রদর্শক। অস্থি — হাড়। বজ্রানল — বজ্রবিদ্যুতের আগুন।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে লেখো :**

২.১ ‘শিকল-পরা ছল’ বলতে কবি প্রকৃতপক্ষে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

২.২ ‘ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।’

—‘বাঁধন-ভয়’ ক্ষয় করতে কারা, কোথায় এসেছেন?

২.৩ ‘মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা’ কীভাবে রচিত হয়?

২.৪ ‘মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।’

— পঙ্‌ক্তিটিতে ‘আবার’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৩.১ স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তির বাসনা কীভাবে শিকল-পরার গান কবিতায় ধরা পড়েছে, তা আলোচনা করো।

৩.২ 'বাঁধন-ভয়কে করবো মোরা জয়' — কেন এই বাঁধন? কারা, কীভাবে এই 'বাঁধন-ভয়'কে জয় করবে?

৪. **দল বিশ্লেষণ করো :**

বন্ধনী, ঝঞ্ঝনা, বজ্রানল, সর্বনাশ, অস্থি।

৫. **ধ্বনিপরিবর্তনের কোন নিয়ম এখানে কাজ করেছে দেখাও:**

বাঁধন, পরে।

৬. **বাক্য রূপান্তর করো :**

৬.১ ভয়- দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ। (জটিল বাক্যে)

৬.২ মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল। (যৌগিক বাক্যে)

৬.৩ তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়। (চলিত গদ্যে)

৭. **পদ চিহ্নিত করো :**

৭.১ তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্বগ্রাস।

৭.২ মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

৭.৩ এবার আনব মাভৈঃ-বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল।

৮. **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :**

শিকল-ঝঞ্ঝনা, চরণবন্দনা, বজ্রানল, মৃত্যুজয়।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এমন কথা কেউ বলবে না। দু-একজন অবশ্যই অসাধারণ ছিলেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় এ কথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁদের সমকক্ষ ব্যক্তির অভাব দেশে তখনো ছিল না, এখনো নেই। অথচ নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরাও অনেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা স্বেচ্ছায় এমন-সব কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন, আজকের সাংসারিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা যাকে হঠকারিতা বলে মনে করবেন। মনে হবে আপন সাধ্যসীমা ভুলে গিয়ে তাঁরা সাধ্যাতীতের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা যেভাবে কাজ করেছেন তাকে একমাত্র সাধনা নামেই অভিহিত করা যায়, মাস-মাহিনার চাকুরে দ্বারা এ-জাতীয় কাজ কখনোই সম্ভব নয়। যে কাজে বহুজনের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন কখনো কখনো সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর্তা অকিঞ্চন, কীর্তি সুমহান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কর্তার তুলনায় কীর্তি বহুগুণে বৃহৎ। বস্তুত তা নয়, কীর্তি কখনো কর্তাকে ছাড়িয়ে যায় না। বাহ্যত যা দৃষ্টিগোচর ছিল না সেই শক্তি তাঁদের চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। সুবৃহৎ কার্যে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন নিষ্ঠা এবং অভিনিবেশ। বিদ্যাবুদ্ধি তো ছিলই, তদুপরি উক্ত দুই গুণসন্নিপাতে সাধারণ মানুষের দ্বারাও অসাধারণ কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল।

এর কৃতিত্ব অনেকাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য, কারণ এরূপ মানুষ শান্তিনিকেতন নিজ হাতে তৈরি করেছে। আমাদের দেশে স্থান-মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে; সেটা কেবলমাত্র স্থান-বিশেষের মাটি-জল-হাওয়ার গুণ নয়। সে স্থানই মহৎ যে স্থান মানুষের কাছ থেকে বড়ো কিছু দাবি করতে জানে। দাবি করবার অধিকার সব স্থানের থাকে না। সে অধিকার অর্জন করতে হয়— অর্জন করতে হয় নিজের দান-শক্তির দ্বারা। যে দিতে জানে সেই দাবি করতে জানে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম। শান্তিনিকেতনই দেশকে প্রথম শিখিয়েছে যে বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাদানের স্থান নয়, বিদ্যাচর্চার স্থান; শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, বিদ্যা-বিকিরণের স্থান। বিদ্যার্জনের পথ সুগম করে দেওয়া বিদ্যাকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যে সময়ে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহও এ-সব কথা ভাবেনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তার শৈশবেই সে-সব কথা ভেবেছে এবং সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে। শান্তিনিকেতনের স্থান-মাহাত্ম্য বলতে এই অর্থেই বলেছি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের সেবায়। সেই জোরে তিনি যাঁদের আহ্বান করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে নিঃসংকোচে সর্বশক্তি নিয়োগের দাবি করতে পেরেছিলেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। বয়সে নবীন, অভিজ্ঞতায় অপ্রবীণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটুকু পর্যন্ত নেই, প্রামাণিক কোনো গ্রন্থ রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। এরূপ সুবৃহৎ কাজের জন্য তাঁর প্রস্তুতি কতখানি সে বিষয়ে সাধারণের মনে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না; থাকলে এমন নিশ্চিন্ত মনে এই বিশাল কার্যভার তাঁর উপরে ন্যস্ত করতে পারতেন না। এই সম্পর্কে একটি কথা অনেক সময় আমার মনে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক-নির্বাচন অনেকটা যেন শেক্সপিয়ারের প্লট-নির্বাচনের মতো। হাতের কাছে যেমন-তেমন একটা গল্প পেলেই হলো, শেক্সপিয়ার চোখ বুজে তাকেই গ্রহণ করেছেন। প্রতিভাবানের হাতে ছাই ধরলেও সোনা হয়ে যায়। অত্যন্ত শীর্ণ বিবর্ণ কাহিনিও রক্তমাংস-অস্থিমজ্জার সংযোগে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, রঙে রসে পূর্ণতা লাভ করেছে, নিষ্প্রাণ কাহিনি প্রাণের স্পন্দনে অপূর্ব বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিত সমালোচকদের মতে মূল কাহিনিতে শেক্সপিয়ার ঐশ্বর্যের আভাস মাত্র ছিল না। অবশ্য এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একমাত্র শেক্সপিয়ারের কবিদৃষ্টিতেই সেই-সব শীর্ণ কাহিনির অনুচ্চারিত সম্ভাবনাটুকু ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। আপাতদৃষ্টিতে যে মানুষ সাধারণ তাঁরও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সর্বদর্শী দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীকে অধ্যাপনার কাজে ডেকে এনে একজনকে দিয়ে লিখিয়েছেন ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থমালা, আর-একজনকে দিয়ে বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান। বিধুশেখর শাস্ত্রী ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ টোলের পণ্ডিত, সেই মানুষ কালক্রমে বহুভাষাবিদ পণ্ডিতে পরিণত হলেন— ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। ক্ষিতিমোহন সেনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁরও জিজ্ঞাসা নতুন পথে প্রবাহিত হলো— মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সংগ্রহ করে ভারতীয় জীবন সাধনার বিস্তৃতপ্রায় এক অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। তিনি দাবি করেছেন, এঁরা প্রাণপণে সেই দাবি পূরণ করেছেন। দাবি পূরণ করতে গিয়ে এঁদের শক্তি দিনে দিনে বিকাশ লাভ করেছেন। ক্ষিতিমোহনবাবু বলতেন, গুরুদেব নিজ হাতে আমাদের গড়ে নিয়েছেন, নইলে যে বিদ্যা শিখে এসেছিলাম, তাও ঠিকমতো ব্যবহার করা আমাদের সাধ্যে কুলোতো না।

রবীন্দ্রনাথ যে চোখ বুজে এদের গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়, চোখ মেলেই করেছিলেন। মানুষ যাচাই করবার বিশেষ একটি রীতি তাঁর ছিল। প্রথমেই দেখে নিতেন দৈনন্দিনের দাবি মিটিয়ে মানুষটির মধ্যে উদ্‌বৃত্ত কিছু আছে কিনা। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা উদ্‌বৃত্তের সাধনা। সংসারের পনেরো-আনা মানুষই আটপৌরে, তাদের দিয়ে নিত্যদিনের গৃহস্থালির কাজটুকু শুধু চলে, বাড়তি কিছু দেবার মতো সম্বল এদের নেই। জমিদারি মহল্লা পরিদর্শন করতে গিয়ে আমিনের সেরেস্তায় নিযুক্ত হরিচরণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— দিনে সেরেস্তার কাজ করো, রাত্রিতে কী করো? হরিচরণ সসংকোচে বলেছিলেন, সন্ধেবেলায় তিনি একটু সংস্কৃতের চর্চা করেন। একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত আছে। পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিয়ে দেখে নিলেন। মানুষ কীভাবে অবসর যাপন করে তাই দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয়। যার মধ্যে উদ্‌বৃত্ত কিছু নেই তার অবসর কাটে না। ঐ সামান্য বাক্যালাপ থেকেই হরিচরণবাবুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটি কবি দেখতে পেয়েছিলেন। এই কারণেই অত্যল্পকালমধ্যে ম্যানেজারের নিকট নির্দেশ এল— তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীটিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দাও। কবি তখন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ‘সংস্কৃতপ্রবেশ’ নামে একটি পুস্তক রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার সহস্র প্রণালী উদ্ভাবনই ঐ পুস্তকের উদ্দেশ্য ছিল। হরিচরণবাবু আসবার পরে কবি তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি হরিচরণবাবুর হস্তে অর্পণ করেন। অধ্যাপনা-কার্যের অবসরে তিনি কবির নির্দেশমতো ঐ পুস্তকরচনা সমাপ্ত করেন।

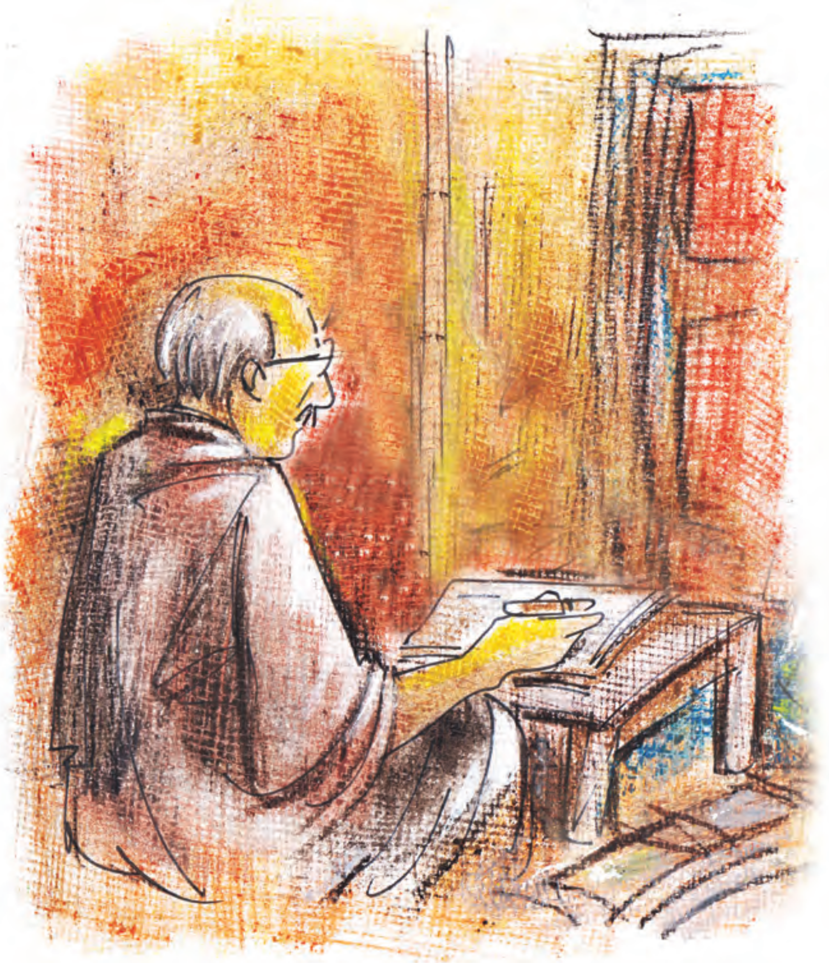

১৩০৯ সালে অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৎসরকাল মধ্যেই হরিচরণবাবু শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কর্মনিষ্ঠার দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহ রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, নতুবা কাজে যোগ দেবার পর দু বৎসর অতিক্রান্ত হতে-না হতেই ৩৭/৩৮ বৎসরের এক যুবককে ঐ সুবৃহৎ অভিধান রচনার কার্যে আহ্বান করতেন না। অপরপক্ষে শান্তিনিকেতনে বসবাসের শুরু থেকেই বিদ্যাচর্চার যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তিনি বোধ করেছেন সে-কথা আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে হরিচরণবাবু নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব তাঁর কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ নম্রহৃদয়ে নতমস্তকে কবির আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। ১৩১২ সালে অভিধান রচনার সূচনা, রচনাকার্য সমাপ্ত হলো ১৩৩০ সালে। মাঝে আর্থিক অনটনের দরুন শান্তিনিকেতনের কর্ম ত্যাগ করে তাঁকে কিছুকালের জন্য কলকাতায় যেতে হয় এবং অভিধান-সংকলনের কাজ বন্ধ থাকে। এটি তাঁর নিজের পক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তেমনি ক্লেশের কারণ হয়েছিল। তাঁকে অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কবি নিজেই উদ্যোগী হলেন। রবীন্দ্রনাথের আবেদনক্রমে বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অভিধান রচনাকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে হরিচরণবাবুর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটি বৃত্তি ধার্য করেন। ১৩১৮ সাল থেকে অভিধান-সংকলনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তেরো বৎসরকাল তিনি এই বৃত্তি ভোগ করেছেন। বাংলাদেশের গৌরবের কথা যে, ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান-রচয়িতা ডক্টর জনসন যে সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, হরিচরণবাবুর বেলায় তা ঘটেনি। মহারাজের মহানুভবতার কথা শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন; আর রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জন্যেই উপযাচক হয়ে মহারাজের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সে কথাও মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি। মুদ্রণকার্য শুরু হবার পূর্বেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। যাঁর সহায়তায় অভিধান রচনা সম্ভব হলো তাঁকে স্বহস্তে একখণ্ড অভিধান কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করতে পারেননি, এই দুঃখটি শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে ছিল। ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথও বিদায় নিলেন। হরিচরণবাবুর করুণ উক্তি, 'যিনি প্রেরণাদাতা, যাঁর অভীষ্ট এই গ্রন্থ তিনি স্বর্গত, তাঁর হাতে এর শেষ খণ্ড অর্পন করতে পারিনি।' কিন্তু হরিচরণবাবু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। বলেছিলেন, 'মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অভিধানের সমাপ্তির পূর্বে তোমার জীবননাশের শঙ্কা নাই।' কবিবাক্য মিথ্যা হয় না, এ ক্ষেত্রেও হয়নি।

পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০ সনে। তার পরেও প্রায় দশ বৎসর কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে— অর্থাভাবে মুদ্রণকার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের সামর্থ্য বিশ্বভারতীর ছিল না। অবশ্য মাঝে এই কয়েক বৎসরও তিনি অভিধানের নানা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজ নিয়েই তার যৎকিঞ্চিত সম্বল নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ক্রমশ প্রকাশের আয়োজন করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মুদ্রণব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্ররা এবং শান্তিনিকেতনের অনুরাগী কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি নিয়মিত গ্রাহক হয়ে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন।

১৩১২ সালে রচনার সূচনা, ১৩৫২ সালে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত। জীবনের চল্লিশটি বছর এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। এ কাজ মহাযোগীর জীবন। বাঙালি চরিত্রে অনেক গুণ আছে, কিন্তু নিষ্ঠার অভাব। এদিক থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালিজাতির সম্মুখে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিলেন। নিষ্ঠার যথার্থ পুরস্কার অভীষ্ট কার্যের সফল সমাপ্তি। এর অধিক কোনো প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। সুখের বিষয়, লৌকিক পুরস্কারও কিছু তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ষোড়শোপচারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সর্বশেষে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট.) উপাধিদানে সম্মানিত করেন।

অভিধান-জাতীয় গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই মতামত দেবার অধিকারী। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি অভিধানে কিছু কিছু ঘাটতি আছে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে—

বিশেষ করে একক চেষ্টায়— কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে অভিধানের পুনর্মুদ্রণের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একবার পুনর্মার্জনার ব্যবস্থা করে নিলে বোধ করি ভালোই হতো। অন্যান্য দেশে এরূপ কার্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো বিদ্বৎ পরিষৎ অর্থাৎ পণ্ডিত গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, একক চেষ্টায় এরূপ বিরাট কাজের দৃষ্টান্ত বিরল। এই অভিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য— বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রত্যেক শব্দের বহুবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ। এই কার্যে যে শ্রম এবং জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা যারা বিশেষজ্ঞ নই, তাদের কাছে অভিধানের এই অঙ্গটি মহামূল্য, ব্যক্তিগতভাবে আমি এর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী।

আমি যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিই তখনো অভিধানের মুদ্রণকার্য শেষ হয়নি। লাইব্রেরিগৃহের একটি অনতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে তাঁকে নিবিষ্ট মনে কাজ করতে দেখেছি।

প্রথম যুগের কর্মীদের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি করে চৌপদী লিখে দিয়েছিলেন। একান্ত মনে কাজে মগ্ন হরিচরণবাবুকে দেখে তাঁর সম্পর্কিত শ্লোকটি আমার মনে পড়ে যেত—

কোথা গো ডুব মেরে রয়েছ তলে
হরিচরণ! কোন গরতে?
বুঝেছি! শব্দ-অবধি-জলে
মুঠাচ্ছ খুব অরথে!

কোথায় কোন গর্তে বসে হরিচরণ শব্দবারিধি থেকে মুঠো মুঠো 'অর্থ' কুড়োচ্ছেন— বর্ণনার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্ত আভিধানিকের মূর্তিটি দিব্যি মিলে যেত।

বলা বাহুল্য, তখন তিনি বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, বয়স পঁচাত্তর উত্তীর্ণ। তখনকার দিনে কে কবে অবসর গ্রহণ করতেন জানবার কোনো উপায় ছিল না, কারণ অবসর গ্রহণের পরেও তাঁরা পূর্ববৎ নিজ আসনে নিজ কাজে অভিনিবিষ্ট থাকতেন। কাজের সঙ্গে মাস-মাহিনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনি অভিধান ছাড়াও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।

অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পরেও তাঁকে নিত্য দেখেছি। প্রাতঃভ্রমণ এবং সান্ধ্যভ্রমণ নিত্যকর্ম ছিল। পথে দেখা হলে ক্ষীণদৃষ্টিবশত সব সময় লোকজন চিনতে পারতেন না। কখনো চিনতে পারলে সস্নেহে কুশলবার্তা জিগ্‌গেস করতেন। বিরানব্বুই বৎসর বয়সে (১৯৫৯ সালে) তিনি দেহরক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের শক্তি অটুট ছিল। শেষ বয়সে তাঁকে দেখলে একটি কথা প্রায়ই মনে হতো। ইংরেজ ঐতিহাসিক তথা সাহিত্যিক গিবন তাঁর 'দি ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' নামক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করে বলেছিলেন, হঠাৎ মনে হলো জীবনের সব কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে, কিছুই আর করবার নেই। মনে খুব একটা অবসাদের ভাব এসেছিল। গিবন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে দীর্ঘ বারো বৎসর কাল একান্ত মনে নিযুক্ত ছিলেন, আর হরিচরণবাবু জীবনের চল্লিশ বৎসর কাল অনন্যমনা হয়ে এক কাজে মগ্ন ছিলেন। কর্মাবসানে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল জানতে কৌতূহল হতো। গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও চোদ্দো বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। যখনই দেখেছি তাঁকে প্রসন্নচিত্ত বলেই মনে হতো। এরূপ সাধক মানুষের মনে কোথাও একটি প্রশান্তি বিরাজ করে। এজন্য সুখে-দুঃখে কখনো তাঁরা বিচলিত হন না।

হাতেকলমে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০৩ — ১৯৯৫) : ইন্দ্রজিৎ নামে সমধিক পরিচিত। *ইন্দ্রজিতের খাতা* ও *ইন্দ্রজিতের আসর* তাঁর প্রধান গ্রন্থ। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে *অচেনা রবীন্দ্রনাথ*, *আপন মনের মাধুরী মিশায়ে*, *কালের যাত্রার ধ্বনি*, *খেলা ভাঙার খেলা*, *শান্তিনিকেতনে একযুগ*, *শেষ পারানির কড়ি*, *সাহিত্যের আড্ডা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১.১ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত দুটি বই-এর নাম লেখো।

১.২ কোন নামে তিনি সমধিক পরিচিত?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন, এমন কয়েকজনের কথা আলোচনা করো।

২.২ 'এর কৃতিত্ব অনেকাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য...' — কোন কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে? তার বহুলাংশ 'শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য' বলে লেখক মনে করেছেন কেন?

২.৩ 'আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম।' – লেখক এ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেছেন?

২.৪ 'আপাতদৃষ্টিতে যে মানুষ সাধারণ তাঁরও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সর্বদর্শী দৃষ্টিতে এড়াতে পারেনি।' — লেখক এ প্রসঙ্গে কাদের কথা স্মরণ করেছেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

২.৫ 'এঁরা প্রাণপণে সেই দাবি পূরণ করেছেন।' — কাদের কথা বলা হয়েছে? কীই বা সেই দাবি? সেই দাবিপূরণে প্রাণপণে তাঁদের নিয়েজিত হওয়ারই বা কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

২.৬ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছিল? প্রবন্ধ অনুসরণে তাঁর সারাজীবনব্যাপী সারস্বত-সাধনার পরিচয় দাও।

২.৭ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের পরিচয় প্রবন্ধটিকে কীভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোচনা করো।

২.৮ 'একক প্রচেষ্টায় এরূপ বিরাট কাজের দৃষ্টান্ত বিরল।' — কোন কাজের কথা বলা হয়েছে? একে 'বিরাট কাজ' বলার কারণ কী?

২.৯ ‘হরিচরণবাবুকে দেখে তাঁর সম্পর্কিত শ্লোকটি আমার মনে পড়ে যেত’ — শ্লোকটি কার লেখা? শ্লোকটি উদ্ধৃত করো।

২.১০ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত অভিধানটির নাম কী? গ্রন্থটির রচনা মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘটনার প্রসঙ্গ প্রাবন্ধিক কীভাবে স্মরণ করেছেন?

২.১১ প্রাবন্ধিকের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রসঙ্গ প্রবন্ধে কীরূপ অনন্যতার স্বাদ এনে দিয়েছে তা আলোচনা করো।

২.১২ ‘তিনি অভিধান ছাড়াও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।’ — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২.১৩ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অনুরাগ কীভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা বিশদভাবে আলোচনা করো।

শব্দার্থ : হঠকারিতা — বিবেচনা না করে কাজ করা। বিদ্যোৎসাহী — বিদ্যা প্রসারে উৎসাহ দানকারী। অকিঞ্চন — নিঃস্ব/দরিদ্র। অভিনিবেশ — মনোনিবেশ। উপযাচক — বিনা আহ্বানে আসা।

বঙ্গীয় শব্দকোষের বর্তমান প্রচ্ছদ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭ — ১৯৫৯) : ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এলাকায় সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক ছিলেন। পরে পাতিসর অফিসের কর্মাধ্যক্ষ হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে কাজ শুরু করেছিলেন, হরিচরণ তিন খণ্ডে *সংস্কৃত প্রবেশ* লিখে তা সমাপ্ত করেন। পাঠ্য রচনাটিতে তাঁর অভিধান সংকলনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

ভালোবাসা কি বৃথা যায় ?

শিবনাথ শাস্ত্রী

অকপটে মানুষ যদি মানুষকে ভালোবাসে, তবে তাহা বৃথা যায় না। পৃথিবীর বড়োলোকদের এই প্রকৃতি দেখি, তাঁহারা ভালোবাসাতেও বড়ো। তাঁহারা যেমন মানুষকে অকপটে ভালোবাসিতে পারিয়াছেন, এমন সাধারণ লোকে পারে না। তাঁহারা মানুষকে ভালোবাসিতেন বলিয়া, মানুষও তাঁহাদিগকে ভালোবাসিত, তাঁহাদের জন্য প্রাণ দিতে চাহিত, তাঁহাদের গুণ চিরদিন স্মরণ করিত।

দুইজন ইংরেজ এদেশের লোককে অকপটে ভালোবাসিতেন। একজন ডেভিড হেয়ার, আর একজন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন (বেথুন)। ইঁহার নামের প্রকৃত উচ্চারণ বিটন, কিন্তু এদেশে বেথুন হইয়া পড়িয়াছে। সেই নামেই সকলে ইঁহাকে জানে। এই দুই ইংরেজ বাংলাদেশে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়াছেন। কীসের গুণে? অকপট ভালোবাসার গুণে। হেয়ার সাহেব একজন সামান্য ঘড়িওয়ালা সাহেব ছিলেন; ঘড়ি তৈয়ার ও ঘড়ি মেরামত করিয়া খাইতেন। বেথুন সাহেব পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল সাহেবের সভাতে এক বড়ো কাজ করিতেন। হেয়ারের পূর্বেও অনেক ঘড়িওয়ালা সাহেব এদেশে আসিয়াছেন এবং এখনও অনেক ঘড়িওয়ালা সাহেব এদেশে আছেন; কই তাহারা তো প্রাতঃস্মরণীয় লোক হন নাই? সেইরূপ মহাত্মা বেথুনের পরেও তো ওই পদে কত বড়ো ইংরেজ আসিয়াছেন, কই তাহারা তো কেহ নাম রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ কী? কারণ এই হেয়ার ও বেথুন এদেশের লোককে অকপটে ভালোবাসিতেন।

হেয়ার সাহেবের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। তিনি স্কটল্যান্ড দেশীয় লোক; প্রায় আশি-নব্বই বৎসর হইল ঘড়িওয়ালার কাজ করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। ঘড়ির কাজে কিছু সংগতি করিয়া কলকাতাতে বাস করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত হেয়ারের পরিচয় হয় ও আত্মীয়তা জন্মে। দুই বন্ধুতে সর্বদা এই কথাবার্তা হইত যে, এদেশের বালকদিগের ইংরেজি শিক্ষার উপায় না করিলে চলিতেছে না। ক্রমে তাঁহাদের পরামর্শ কাজে

দাঁড়াইল। ১৮১৭ সালে রামমোহন রায় ও হেয়ারের উদ্যোগে ও তখনকার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট সাহেবের সহায়তায়, এদেশের বালকদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য হিন্দু স্কুল খোলা হইল। তদবধি হেয়ার আর সকল কাজ ছাড়িয়া এই কাজে লাগিয়া গেলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কলকাতার স্থানে স্থানে অনেকগুলি স্কুল খুলিলেন এবং একটি সভা স্থাপন করিয়া স্কুলপাঠ্য পুস্তকসকল প্রকাশ করাইতে লাগিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হেয়ার বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার পিতা।

কিন্তু আমরা হেয়ারের যে সদগুণ স্মরণ করিয়া মুগ্ধ, সে তাঁহার অকপট ভালোবাসা। বিদেশি হইয়া এদেশের লোককে এমন অকপটে কেহ ভালোবাসেনাই। সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি হেয়ার প্রতিদিন একখানি পালকিতে করিয়া স্কুল দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পালকিতে নানাপ্রকার ঔষধ থাকিত; যেন সঙ্গে একটি ডিসপেনসারি! সঙ্গে ঔষধ লইবার অভিপ্রায় এই, পথে যাইতে যাইতে যে সকল পাড়া আছে, তাহাদের বাড়ি হইয়া যাইতেন এবং যাহাদের ঔষধ কিনিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহাদিগকে ঔষধ দিয়া যাইতেন। তাহার সেই প্রসন্ন ও প্রেমপূর্ণ মুখ প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া, অনেক বাড়ির বৃদ্ধা গৃহিণীদের তাঁহার প্রতি এমন ভাব জন্মিয়াছিল যে, হেয়ার আসিলে তাঁহাদের বোধ হইত, কে যেন আপনার লোক আসিয়াছে।

হেয়ার হিন্দু স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলেদের এত ভালোবাসিতেন যে, একটার সময় টিফিনের ছুটি হইলে হেয়ারের আর অন্য কাজ থাকিত না; তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া ছেলেদের খেলা দেখিতেন। একদিন হেয়ার দেখিলেন, একটি বালক অপর একটি বালকের কাঠের বলটি কাড়িয়া লইয়া গোলদিঘির জলে ফেলিয়া দিল। তাহাতে ওই বালকটি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেয়ার কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি দৌড়াইয়া বিবাদস্থলে উপস্থিত হইলেন। দুষ্টু বালকটিকে তিরস্কার করিয়া যে কাঁদিতেছিল, তাহাকে কোলে তুলিয়া বুকে ধরিয়া অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন— তুমি কাঁদিও না, তোমাকে কালই ভালো বল দিব। তার পরদিন অতি প্রত্যূষে হেয়ার পদব্রজে লালদিঘির ধার হইতে সুকিয়া স্ট্রিটে, স্কুলের কার্যাধ্যক্ষ পরলোকগত হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, 'হরমোহন, আজ স্কুলে যাইবার সময় গোটাকতক কাঠের বল লইয়া যাইও।' যথাসময়ে হেয়ার স্কুলে আসিলেন; সেই বালকটির ক্লাসে গিয়া তাহাকে কোলে করিয়া একটি সুন্দর বল তাহার হাতে দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, খুশি হয়েছ তো?' সে মুখ ভার করিয়া বলিল— 'আমার সে বল এর চেয়েও ভালো ছিল।' হেয়ার আর এক হাতে আর একটি বল দিলেন;— 'এবার?' সে তাহাতেও সন্তুষ্ট নয়। অবশেষে তাহার দুইটি বল ও দুই বগলে দুই বল দিয়া আসিয়া বলিলেন,—'এবার?' তখন সে সন্তুষ্ট হইল, হেয়ারও নিস্তার পাইলেন।

আর একবার চন্দ্রশেখর দেব নামক একটি বালক লালদিঘির ধারে হেয়ারের বাড়িতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। বসিয়া কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হেয়ারের আহারের সময় উপস্থিত, ওদিকে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টি থামিতে রাত্রি কিছু অধিক হইয়া গেল। বৃষ্টি থামিয়া গেলেই চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরিতে প্রস্তুত, কিন্তু হেয়ার তাহাকে সেই রাত্রে একাকী ছাড়িয়া দেন কীরূপে? একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার লালবাজারের মাতাল গোরাদের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। হেয়ার বলিল, 'চন্দর, বোসো আমি তোমাকে আগাইয়া দিব।' চন্দ্র বলিল, 'আপনার যাইবার প্রয়োজন নাই, আমি একাই যাইতে পারিব।' হেয়ার কোনোমতেই তাহা শুনিলেন না; একটি প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া চন্দ্রশেখরের সহিত কথা কহিতে কহিতে বাহির হইলেন। বউবাজারের চৌরাস্তার নিকটে আসিয়া চন্দ্রশেখর আবার সাহেবকে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিল।

হেয়ার বলিলেন—'চলো, পটোলডাঙার মোড় পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে আসি।' পটোলডাঙার মোড়ের নিকট আসিয়া হেয়ার দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'তুমি বাসাতে যাও।' চন্দ্রশেখর পটোলডাঙার নিকটেই থাকিত, বাসাতে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই কে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতেছে, 'চন্দর, চন্দর।' বাসার লোকে দ্বার খুলিয়াই দেখে হেয়ার সাহেব। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চন্দর কি ঘরে পৌঁছাইয়াছে?' উত্তর—হ্যাঁ, তখন হেয়ার সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিলেন।

এ কী ভালোবাসা। ছেলেটির সঙ্গে প্রায় এক ক্রোশ আসিয়াও সাহেবের ভাবনা গেল না; ভাবিলেন, একবার দেখি, ছেলেটা বাসাতে পৌঁছাইল কিনা। মায়েই মানুষকে এত ভালোবাসিয়া থাকে, অন্যে কি এত ভালোবাসিতে পারে? একবার একটি প্রকাশ্য সভামধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামক একজন শিক্ষিত যুবক বক্তৃতা করিবার সময় হেয়ারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,— 'আপনি আমাদের জ্ঞানদাতা পিতা,' বলিয়াই সংশোধনপূর্বক পুনরায় বলিলেন— 'না না, আপনি আমাদের মাতা।' ঠিক কথা! ঠিক কথা! হেয়ার বাঙালির ছেলেকে মায়ের মতো ভালোবাসিতেন।

সে ভালোবাসা কি বৃথা গিয়াছে? দ্যাখো, হেয়ারের ভালোবাসা মূর্তি ধরিয়া ইংরেজি শিক্ষারূপে রহিয়াছে। যেদিন হেয়ারের মৃতদেহ কবরে দেওয়া হয়, শুনিতে পাই, সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ হইয়াছিল। তথাপি শহরের ছোটোবড়ো ভদ্রলোক আসিতে আর বাকি ছিল না। সেদিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি, যে হেয়ারের মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত দশ হাজার স্কুলের বালক ও বাঙালি ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। হেয়ার আর এ লোকে নাই, এ সংবাদ যখন শহরে ছড়াইয়া পড়িল, তখন অনেক বাঙালি ভদ্রলোকের গৃহে স্ত্রীলোকেরা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক বালক অনেক দিন যেন মৃতাশৌচ ধারণ করিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের উঠানে হেয়ারের যে প্রতিমূর্তি আছে, তাহা করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এদেশের লোকে দিয়াছে। তাই বলি, ভালোবাসা কি কখনও বৃথা যায়।

আর এক মহাত্মা বেথুন সাহেব। হেয়ার বাঙালির ছেলেদের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, বেথুন বাঙালির মেয়েদের জন্য তাহা করিয়াছেন। ইনি গভর্নর জেনারেলের আইনমন্ত্রী হইয়া বড়ো পদ লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। এদেশের রমণীদের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড়ো কষ্ট হইয়াছিল। যাহাতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয়, সেজন্য তিনি প্রাণপণ করিলেন। সেজন্য কলকাতাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিলেন।

নিজে সর্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। বালিকাদিগকে লইয়া খেলা করিতে ভালোবাসিতেন। শুনিয়াছি, এমনি তাঁর ভালোবাসা ছিল, যে চারিপায়ে ঘোড়া হইয়া বাঙালির মেয়েকে পিঠের ওপর চড়াইয়া চলিতেন, ও জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কেমন মেম? কেমন ঘোড়া?' তিনি স্কুলের মেয়েদিগকে নিজের গাড়িতে করিয়া বড়ো বড়ো সাহেবদের বাড়িতে লইয়া যাইতেন; তাহাদিগকে প্রায় কাপড়-অলংকার প্রভৃতি দিতেন; কেহ একটু পড়িতে পারিতেছে দেখিলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেন। এ সকল কথা শুনিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। সাধে কি বিদ্যাসাগর বেথুনের নাম করিলে কাঁদিয়া ফেলিতেন? বেথুন মৃত্যুকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুলের জন্য অনেক হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই পুণ্যে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় এখন কলেজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা হইতে এখন ছাত্রীরা বিএ, এমএ পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। বেথুনের ভালোবাসা কি বৃথা গিয়াছে? যে ভালোবাসা স্মরণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো লোকের চক্ষে জল পড়িয়াছে, সে ভালোবাসা কি বৃথা গিয়াছে? ইউরোপের অনেক দেশে সে দেশের বড়োলোকদিগের ছোটো ছোটো প্রতিমূর্তি কিনিতে পাওয়া যায়। লোকে কিনিয়া ঘরে রাখে, বালক-বালিকারা সেদিন হইতে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে শেখে। আমাদের বোধহয় হেয়ার, রামমোহন ও বেথুনের প্রতিমূর্তিও ঘরে ঘরে থাকা উচিত।

ঘুরে দাঁড়াও

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সরতে সরতে সরতে
        তুমি আর কোথায় সরবে?
এবার ঘুরে দাঁড়াও।

ছোট্ট একটা তুক করে বাইরেটা পালটে দাও—

সাইকেল-রিকশোগুলো শিস দিয়ে চলে যাক বনে-বনান্তরে,
কাদা-ভর্তি রাস্তা উঠে পড়ুক ছায়াপথের কাছাকাছি,
গাছগুলো নদীর জলে স্নান করে আসুক,
সা-রা-রা-রা করে জেগে উঠুক উপান্তের শহরতলি।

তুমি যদি বদলে দিতে না পারো
        তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে।
এখন হাত বাড়াও, ধরো
যেখানে আছ, সেখান থেকেই সবকিছুকে টেনে আনো,
নইলে   সরতে সরতে সরতে
        তুমি বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাবে।
এখন ঘুরে দাঁড়াও॥

হাতে কলমে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৩ —২০০৭): বিশিষ্ট কবি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে *এক ঋতু*, *সদর স্ট্রীটের বারান্দা*, *নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি*, *হাওয়া স্পর্শ করো* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি *অলিন্দ* নামে একটি কবিতাপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১.১ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সম্পাদিত কবিতা পত্রিকাটির নাম কী?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ কবিতায় কবি কোন আহ্বান জানিয়েছেন?

২.২ ‘ছোট্ট একটা তুক করে বাইরেটা পালটে দাও -’— ‘বাইরে’টায় কী ধরনের বদল ঘটবে বলে কবি আশা করেন? সেই কাঙ্ক্ষিত বদল ঘটলে জীবন কীভাবে অন্যরকম হবে বলে কবি মনে করেন?

২.৩ ‘সরতে সরতে সরতে
তুমি আর কোথায় সরবে?’ — কবি কোথা থেকে এই ‘সরণ’ লক্ষ করেছেন? এক্ষেত্রে তাঁর দেওয়া পরামর্শটি কী?

২.৪ ‘এবার ঘুরে দাঁড়াও।’ আর ‘এখন ঘুরে দাঁড়াও।’ — পঙ্ক্তি দুটিতে ‘এবার’ আর ‘এখন’ শব্দদুটির প্রয়োগ সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৩. নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :

৩.১ তুমি আর কোথায় সরবে? (প্রশ্ন পরিহার করো)

৩.২ এবার ঘুরে দাঁড়াও। (না-সূচক বাক্যে)

৩.৩ তুমি যদি বদলে দিতে না পারো
তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে। (সরল বাক্যে)

৩.৪ নইলে সরতে সরতে সরতে
তুমি বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাবে। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৩.৫ গাছগুলো নদীর জলে স্নান করে আসুক। (নির্দেশক বাক্যে)

৪. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

বনান্তর, ছায়াপথ, উপান্ত, সাইকেল-রিকশো

সুভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপ স্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন। কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে

নিজের অংশরূপে দেখেন—কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো ; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা-অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত হয়, কখনো মুদ্রিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমিষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট ; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুতপদক্ষেপে প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর একেবারে নদীর উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার ; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা, জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত— একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না, তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল ; গৃহে যেদিন কোনও কঠিন

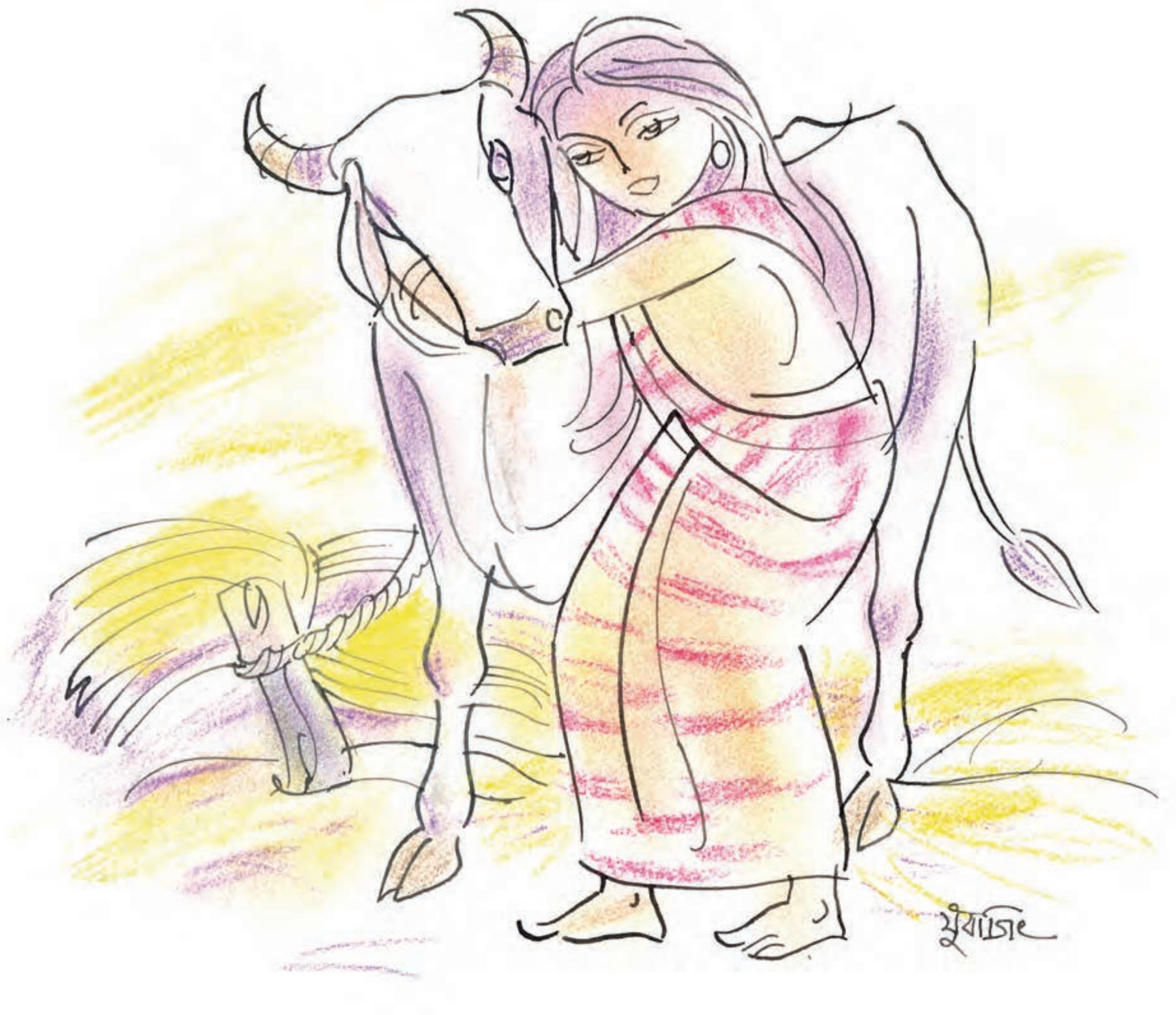

কথা শুনিত তখন সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত। — তাহার সহিষ্ণুতা - পরিপূর্ণ বিষাদ শান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কি একটা অন্ধ অনুমান শক্তি দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে সিং ঘসিয়া ঘসিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবক ও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণির জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কীরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের

প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজকর্মে আমোদ-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ—ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্ণে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয়া লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, 'তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।'

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত ; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত ; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত ; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রুপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে কে বসিয়া ?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া—যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত , এমন-কি , তাহা অতিক্রম করিয়াও থমথম করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি , একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রী পুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ‘চলো, কলিকাতায় চলো।’

বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশাঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক জন্তুর মতো তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্ণে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, ‘কী রে, সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস, আমাদের ভুলিস নে।’ বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে ‘আমি তোমার কাছে কী দোষ

করিয়াছিলাম’, সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল ; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না। ; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া সয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসঙ্গীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ টপ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, ‘তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।’

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।

সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয়, এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু-সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন— কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, ‘মন্দ নহে।’

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ-মা দেশে চলিয়া গেল— তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায়— ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না— বালিকার চিরনীবর হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

হাতে কলমে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথাকাহিনী, সহজপাঠ, রাজর্ষি, ছেলেবেলা, শিশু, শিশু ভোলানাথ, হাস্যকৌতুক, ডাকঘর* প্রভৃতি রচনা শিশু ও কিশোর মনকে আলোড়িত করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে *Song Offerings* (গীতাঞ্জলি)-এর জন্য এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

১.১ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত কোন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত লিখতেন?

১.২ ভারতের কোন প্রতিবেশী দেশে তাঁর লেখা গান জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ সুভার প্রকৃত নাম কী?

২.২ সুভার বাবা কে?

২.৩ সুভা কোন গ্রামে বাস করত?

২.৪ গল্পে সুভার কোন কোন বন্ধুর কথা রয়েছে?

২.৫ কে সুভাকে 'সু' বলে ডাকত?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ 'সে নির্জন দ্বিপ্রহর মতো শব্দহীন এবং শব্দহীন'— সুভা সম্পর্কে এ রকম উপমা লেখক ব্যবহার করেছেন কেন?

৩.২ চণ্ডিপুর গ্রামের বর্ণনা দাও।

৩.৩ সুভার সঙ্গে সর্বশী ও পাঙ্গুলির সম্পর্ক কী রকম ছিল?

৩.৪ 'এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত'— প্রতাপের কাছে সুভা কীভাবে মর্যাদা পেত, তা গল্প অবলম্বনে লেখো।

৩.৫ 'তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল'— কাদের সম্পর্কে এ কথা লেখক বলেছেন? তাঁর এরূপ মন্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ করো।

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ 'প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়'— মানুষের ভাষার অভাব কীভাবে প্রকৃতি পূরণ করতে পারে তা আলোচনা করো।

৪.২ সুভার সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর বন্ধুত্ব কেমন ছিল তা লেখো।

৪.৩ শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রিতে সুভার মনে অবস্থা কেমন ছিল? তার মনের অবস্থা এরকম হওয়ার কারণ কী?

৪.৪ গল্পের একেবারে শেষ বাক্যটি গল্পের ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োজন আলোচনা করো।

৪.৫ মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর বন্ধুত্ব নিয়ে আরো দু একটি গল্পের নাম লেখো এবং 'সুভা' গল্পটির সঙ্গে তুলনা করো।

শব্দার্থ : দস্তুরমতো — রীতিমতো/বিলক্ষণ। বিরাজ — সগৌরবে অবস্থান। জাগরূক — জাগ্রত / সজাগ। তরজমা — অনুবাদ। অকর্মণ্য — যে লোক কোনো কাজের নয়। অনির্বচনীয় — যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মর্মবিদ্ধ — হৃদয় বিদারক। কপোল — গাল। শষ্পশয্যা — কচি ঘাসের বিছানা। নেপথ্য — অন্তরাল। শুক্তি — ঝিনুক। অনতিবিলম্বে — শীঘ্রই। অন্তর্যামী — ঈশ্বর।

৫. **নীচের বাক্যগুলিকে কর্তা-খণ্ড ও ক্রিয়া-খণ্ডে ভাগ করে দেখাও :**

৫.১ সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন ও এবং শব্দহীন।

৫.২ সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

৫.৩ এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ব আছে।

৬. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৬.১ সুভা তেঁতুলতলার বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতি দূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। (জটিল বাক্যে)

৬.২ বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিল। (জটিল বাক্যে)

৬.৩ বাণীকণ্ঠের ঘর একেবারে নদীর উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম, কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকোবাহী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (একটি জটিল বাক্যে পরিণত করো।)

৬.৪ প্রকৃতি যেন তাহার ভাষা অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। (একটি সরল বাক্যে পরিণত করো)

৭. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৭.১ অনু —
ভব = অনুভব
মান = অনুমান
☐ = ☐
☐ = ☐

৭.২ প্র —
☐ = ☐
☐ = ☐
☐ = ☐

৭.৩ দিগ্‌বিদিক = ☐ + ☐

৭.৪ ☐ > গেরস্ত

৭.৫ পঞ্জিকা > ☐

পরাজয়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগে ফুঁসছিল রঞ্জন। একটু আগে ও সবকটা কাগজে বারপুজোর রিপোর্ট পড়েছে। ছবি দেখেছে। রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। ওদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে কে কে ছিল সেইটাই ও দেখতে চেয়েছিল বেশি করে। এখন কাগজগুলো পড়ে আছে টেবিলের ওপর। আর রঞ্জন ঘরের মধ্যে চরকির মতো ঘুরছে।

এত দুঃখ, এত ব্যথা সে কখনও পায়নি। গত পনেরো বছর যে ক্লাবের জন্যে সে রক্ত ঝরাল আজ তারাই কি না তাকে এত বড়ো অপমানটা করল। ওকে একবার ডাকার দরকার মনে করল না! প্রত্যেক বছর ফোনের পর ফোন আসে। প্রেসিডেন্ট ফোন করেন, সেক্রেটারি ফোন করেন, ফুটবল সেক্রেটারি ফোন করেন। ক্লাবের বারপুজোয় যাবার জন্যে বলতে বাড়িতেও আসেন কেউ কেউ। তারপর পয়লা বৈশাখ সাত সকালে মাঠে যাবার জন্যে গাড়ি এসে হাজির হয়। রঞ্জনও চান-টান করে তৈরি থাকে। গাড়ি এলহে বেরিয়ে পড়ে। গত পনেরো বছর ধরে এই রেওয়াজ চলছিল। গত বছরই রঞ্জন অনুভব করেছিল, ওকে নিয়ে মাতামাতিটা ঠিক

আগের মতো আর নেই। কেমন যেন একটু ছাড়া ছাড়া ভাব। গায়ে মাখেনি রঞ্জন। ভেবেছিল, ও তো পুরোনো খেলোয়াড়, এত নতুন খেলোয়াড়দের দিকে, যারা ক্লাব ছেড়ে যাবার কথা ভাবছে তাদের দিকে বেশি নজর দেওয়া ভালো। তবু মনটা যে একটু খুঁত খুঁত করেনি তা নয়। একবার মনে হয়েছিল, তবে কি ক্লাবে ওর দর কমে গেছে? কথাটা মনে হওয়ায় ওর মনটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবে গুরুত্ব দেয়নি।

ফুটবল সেক্রেটারি আর কোচ এসে ওর সঙ্গে দল গড়া নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কাকে কাকে এবার দলে আনা যায় তাই নিয়ে ওর পরামর্শ চেয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলার পর ওর মনের মধ্যে জমে ওঠা মেঘটা কেটে গিয়েছিল। ঠিক এক বছর আগের ঘটনা।

আর এবার!

গাড়ি পাঠানো তো দূরের কথা, মাঠে যাবার জন্যে ওকে কেউ একবার বললও না। একটা টেলিফোন ও তো করতে পারত। ও ভেবেছিল, বলেনি তো কী হয়েছে। গাড়ি নিশ্চয়ই পাঠাবে। তাই সক্কাল বেলায় চান-টান করে ও রেডি হয়ে বসেছিল। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল, সকাল গড়িয়ে গেল গাড়ি এল না। কেউ টেলিফোন করেও বলল না, গাড়ি পাঠাতে পারলাম না—তুই চলে আয়।

সারাটা সকাল ও ছটপট করে বেড়িয়েছিল। দুঃখ আর অভিমান ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। এই রকম কষ্ট

কোনোদিন সে পায়নি। পরে সে ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল। বুঝেছিল, ইচ্ছে করে ওকে অপমান করা হয়েছে। এইভাবে ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, ওকে আর ক্লাবের দরকার নেই। গত পনেরো বছরে শত প্রলোভনে সে ভোলেনি, লক্ষ লক্ষ টাকার অফার, বিশাল চাকরির হাতছানি সে যে ক্লাবের কথা ভেবে হাসতে হাসতে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই ক্লাবই আজ তাকে এত বড়ো অপমান করল। ক্লাবের বারপুজোয় একবার ডাকার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করল না!

রঞ্জন সারাটা দিন আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। হালখাতার কোনো নেমন্তন্নেও যায়নি। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। বুঝতে পারছিল না কী করবে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ওর মনের মধ্যে জমে ওঠা দুঃখ আর অভিমান রূপান্তরিত হয়েছিল রাগে। যাদের জন্যে এত বছর ধরে সে নিজেকে নিঃশেষ করে দিল আজ তার খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে তাদের কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার পেল!

কথাটা মনে হতেই রাগে ফুঁসে উঠল রঞ্জন। ও কি ফুরিয়ে গেছে? ও কি শেষ হয়ে গেছে? ওরা কি তা হলে তাই ভাবছে? ঠিক আছে, ওদের চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করল। খেলার মাঠেই সে প্রমাণ করে দেবে যে এখনও ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু কী ভাবে? ক্লাবের কর্তাদের হাবভাব দেখে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, তাকে আর ওদের দরকার নেই। নতুন ছেলেদের নিয়ে যে মাতামাতি করা হচ্ছে তার সিকিভাগও যদি ওর মতো পুরোনো খেলোয়াড়দের নিয়ে করা হতো তাহলে অবস্থা অন্যরকম হতো। তবে কি ওকে ক্লাব ছেড়ে দিতে হবে? আঁতকে উঠল রঞ্জন। এ সে কী ভাবছে? ক্লাব ছেড়ে দেবে— সে? অসম্ভব। এই ক্লাবের জার্সিকে সে মায়ের মতো ভালোবাসে। গত পনেরো বছর ধরে ঐ দশ নম্বর জামাটা ওকে শক্তি দিয়েছে, ওকে যশ, মান, অর্থ প্রতিপত্তি সবই দিয়েছে। রঞ্জন কল্পনাও করতে পারে না। এ কথা ভাবাও যে পাপ। তা হলে সে কী করবে? ভেবে পায় না রঞ্জন। ছটফট করে নিজের মনে।

অফিসে গিয়েও নিস্তার নেই। অনেক খেলোয়াড়ই ওদের অফিসে কাজ করে। তা ছাড়া খবরের কাগজে ফলাও করে সব বেরিয়েছে। তাই জনে জনে এসে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, রঞ্জনদা তুমি কাল ক্লাবে যাওনি?

না রে! কাল সকালেই আমায় কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল।

ও তাই বলো! আমরা তো ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, নান্টুদাকে জিজ্ঞেস করলাম। নান্টুদা বলল, ঠিক জানে না তুমি কেন এলে না। আমরাও ভেবে পাচ্ছিলাম না কি হলো।

রঞ্জনের মনের মধ্যে সেই কষ্ট কষ্ট ভাবটা আবার জেগে উঠল। নান্টুদা বাড়ি যায়, বারবার ফোন করে, গাড়ি পাঠায়— আর এবার জানেই না কেন সে ক্লাবের বারপুজোয় যায়নি। তবে কি ওরা ওকে ক্লাবে রাখতে চায় না? এইভাবে অপমান করে বুঝিয়ে দিচ্ছেও ক্লাবে অবাঞ্ছিত। রঞ্জনের মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করে উঠল। না, আজ আর অফিসে থাকতে পারবে না। উঠে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। কিন্তু যাবে কোথায়? বাড়িও যাওয়া যায় না। বাড়ি গেলে মা আবার ভাবতে বসবে। অন্য সময় হলে ক্লাবে চলে যেত। একবার ভাবল, ক্লাবেই যাবে। পরমুহূর্তে ওর মনটা বিদ্রোহ করে উঠল। গতকাল ক্লাবে অমন হৈ চৈ হলো, অত ঘটা করে বারপুজো হলো সেখানে থাকার জন্যে যখন ওকে কেউ বলেইনি তখন ও গাড়িটা নিয়ে চলে গেল গঙ্গার ধারে। এখন অফিসের সময়, স্কুল-কলেজও খোলা। এখন নিশ্চয়ই গঙ্গার ঘাটে কোনো চেনা লোকের সামনে ওকে পড়তে হবে না। গাড়িটা পার্ক করে রঞ্জন একটা বেঞ্চির উপর গিয়ে বসল। গঙ্গার ধারে গাছের পাতায় পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া। কানে ভেসে আসে পাখির ডাক। গঙ্গার জলে ছোটো ছোটো ঢেউ। দূরে নোঙর করে কটা ছোটো বড়ো জাহাজ। রঞ্জন নামগুলো পড়ার চেষ্টা করে। অনেকগুলো নৌকো দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর

আশায়। ফেরি স্টিমারগুলোর জন্য ওদের খুব অসুবিধা হয়ে গেছে। দূরে কোথায় কোনো এক পাতার আড়ালে একটা কোকিল ডাকছে। কোকিলের ডাক আজকালতো আর শোনাই যায় না। রঞ্জনের মন অনেকটা হালকা হয়ে যায়। ও ঠান্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করে ওর এখন কী করা উচিত। ওদের ক্লাবের কর্তারা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে ওকে আর দরকার নেই। তাহলে কি ও ক্লাব ছেড়ে দেবে? কথাটা মনে হতেই ওর বুকের মধ্যেটা কীরকম যেন করে উঠল। বুকের মধ্যে চেপে রাখা যন্ত্রণাটা ঠেলে উপরের দিকে উঠে এসে কণ্ঠার কাছে দলা পাকিয়ে আটকে গেল। রঞ্জন বুঝল, ওর চোখদুটো ভারী হয়ে উঠেছে। শুধু ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা। রঞ্জন পকেট থেকে রুমালটা বের করল। চোখটা মুছে রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। কী করবে ও ঠিক করে ফেলেছে। দুটো দিন ও অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে ওর সঙ্গে যদি ক্লাবের কেউ যোগাযোগ করে ভালো, না করলে ও ক্লাব ছেড়ে দেবে। না, খেলা ও ছাড়বে না। দেখিয়ে দেবে, ও ফুরিয়ে যায়নি।

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর রঞ্জনের মন অনেকটা শান্ত হলো। ও উঠে দাঁড়াল। এখন কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে গাড়িতে উঠে বসল।

পরের দুটো দিন ছটফট করে বেড়াল রঞ্জন। অফিস ছাড়া আর কোথাও গেল না। কারও সঙ্গে ভালো ভাবে কথাও পর্যন্ত বলল না। অফিসে সহকর্মী খেলোয়াররা ওর চেয়ে বয়সে ছোটো। রঞ্জনদাকে অত গম্ভীর দেখে তারা আর কাছে ঘেঁষল না। দুদিন পুরো সময় অফিস করল রঞ্জন। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই প্রথম বোধ হয় রঞ্জন সরকারি অফিসে কাটাল। রঞ্জন আশা করেছিল যদি ক্লাবের কেউ আসে। বাকি সময় বাড়িতে টেলিফোনের কাছাকাছি। বাড়ির লোক অবাক, ছেলেটার হলো কী! বাড়ি থেকে নড়ছে না মোটেই। তবে ওর চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে আছে। তাই কেউ আর ঘাঁটায়নি ওকে। দুটো দিন কেটে গেল — ক্লাব থেকে কেউ আসাতো দূরের কথা কেউ একটা টেলিফোন পর্যন্ত করল না।

নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত রঞ্জন তৃতীয় দিন রাত্তিরে টেলিফোন করল অন্য বড়ো ক্লাবের সেক্রেটারিকে।

স্বপনদা আমি রঞ্জন সরকার বলছি।

রঞ্জন—মাই গড্। তুমি আমায় ফোন করবে কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। যেমন আছ ভাই?

ভালোই।

তোমাদের ক্লাবের কী খবর? খুব ধুমধাম করে এবার বারপুজো হলো। শুনলাম তুমি যাওনি।

রঞ্জন একটু ইতস্তত করে আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ স্বপনদা... ওরা আমাকে ডাকেনি। কী বলছো রঞ্জন! তোমায় ওরা ডাকেনি এ কখনও হতে পারে? তুমি যে ওদের জন্যে তোমার জীবন দিয়ে দিয়েছ!

তার পুরস্কার এতদিনে পেলাম স্বপনদা। অবহেলা , অপমান।

ওরা তোমায় একবার ফোনও করেনি?

না স্বপনদা...

রঞ্জনের গলা জড়িয়ে এল। স্বপন যা বোঝার মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিল।

রঞ্জন তুমি বাড়ি থেকে বলছো তো? আমি আসছি । আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

ঠিক আছে।

রঞ্জন টেলিফোনটা রেখে দিল। এতদিন ঐ স্বপনরাই ওকে বার বার ফোন করেছে। দেখা করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়েছে। রঞ্জন পাত্তাও দেয়নি। নিজের ক্লাবকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। পনেরো বছর আগে সেই যে খিদিরপুর থেকে এসেছিল তারপর আর কোনোদিন সে ক্লাব ছাড়েনি। বাংলার হয়ে খেলেছে, ভারতের হয়ে খেলেছে। একাধিকবার বাংলা আর ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছে। অর্জুন পুরস্কার পেয়েছে। ক্লাবপ্রীতির আদর্শ নমুনা হিসেবে এতদিন ওর নামই সকলে উল্লেখ করত। অন্য ক্লাব যখন ওকে তিন-চার লাখ টাকা দেবার কথা বলতও তখন নিজের ক্লাব থেকে এক-দেড় লাখ টাকা নিয়েই খুশি থাকত বিনিময়ে সে শুধু চেয়েছিল একটু সম্মান, একটু ভালোবাসা, একটু আন্তরিকতা। তার এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবার সে কি পেল? অপমান আর অবহেলা। বারপুজোয় না ডাকা মানেই তো বুঝিয়ে দেওয়া তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই। রঞ্জনের মনে পড়ল নান্টুদা একদিন বলেছিল, বারপুজোর দিন ক্লাবের সব থেকে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়দের মাঠে আনতেই হয়। 'যাদের আনা হয় না — বুঝবি তাদের না হলেও ক্লাবের চলে যাবে।'

এতদিনে রঞ্জন তাহলে সেই দলে পড়ল। বারপুজোর দিন তাকে না ডেকে ক্লাব বুঝিয়ে দিল, রঞ্জন সরকার, তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই। কথাটা মনে হতেই রঞ্জনের শরীরটা টানটান হয়ে উঠল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে ফুঁসে উঠল। এই অপমান সে মুখ বুজে সহ্য করবে না।

সেই মুহূর্তে কলিং বেলটা বেজে উঠল। রঞ্জন বুঝল, স্বপন এসে গেছে।

স্বপন জানেন টোপ খাওয়া মাছ কী ভাবে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে হয়। তাই ঘরে ঢুকেই বললেন, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মন খারাপ করছ কেন রঞ্জন?

সামান্য ব্যাপার? আপনি কী বলছেন স্বপনদা! এত বড়ো অপমান ...

দেখো কোনো কারণে ভুল বোঝাবুঝিও তো হয়ে থাকতে পারে!

তারপর দুদিন কেটে গেছে স্বপনদা — ওরা আসা তো দূরের কথা কেউ একটা ফোন পর্যন্ত করেনি।

সত্যি ওরা তোমার সঙ্গে উচিত কাজ করেনি।

আপনি বলুন স্বপনদা — এই ক্লাবের জন্য আমি আমার জীবন দিয়েছি। আপনারাই তো বারবার লক্ষ লক্ষ টাকার অফার দিয়েছেন। আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। ওরা যা দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। আমায় মাথায় তুলে সবাই নাচুক এ আমি কোনোদিন চাইনি। চেয়েছিলাম একটু সম্মান, একটু মর্যাদা। ওরা এবার সেটাও দিল না। উল্টে বুঝিয়ে দিল — আমাকে আর ওদের দরকার নেই।

এখন তুমি কী করতে চাও?

রঞ্জন ইতস্তত করে। মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারে না। ওকে ইতস্তত করতে দেখে স্বপনবাবু বললেন, তুমি যদি আমাদের ক্লাবে আসতে চাও তাহলে তোমায় আমরা মাথায় তুলে নিয়ে যাব। তোমার প্রাপ্য সম্মান তুমি পাবে। আর টাকাকড়ির ব্যাপারে —গত বছর তোমার ক্লাব যা দিয়েছিল তার চেয়ে কম তো দেবোই না। বেশি দেবার চেষ্টা করব ...

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে উঠল, স্বপনদা টাকার কথা তুলবেন না। আমি টাকার জন্যে দল ছাড়ছি না। আমি ... আমি ...

আমি জানি রঞ্জন! মনে রেখো টাকারও দরকার আছে। ঠিক আছে... ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমায় শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি...

কী?

তুমি মন স্থির করে ফেলেছ তো? পরে পিছিয়ে আসবে না? আর একটু ভেবে দেখো। আমি জানি, ক্লাব তোমার কাছে কী! খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে তুমি সেই ক্লাব ছেড়ে দিতে চাইছ। আর একটু ভেবে দেখো। ওরা সত্যিই তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। এই ভাবে তোমায় অপমান করার কোনো অধিকার ওদের নেই। এ অন্যায় ... অন্যায়...

স্বপনদার কথা শুনে রঞ্জনের মনের মধ্যে চেপে রাখা রাগটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। ও বুঝল না, ওকে তাতাবার জন্যেই স্বপন ও কথা বলছেন। বলল, না না স্বপনদা আমি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি। এ অপমান আমি সহ্য করব না। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।

ঠিক আছে। আমি একবার ঘোষদার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। এবার দলবদলের সময় পিছিয়ে যাওয়ায় দেখছি ভালোই হয়েছে। তুমি প্রথম দিনেই সই কোরো। দাঁড়াও ঘোষদার সঙ্গে তোমায় কথা বলিয়ে দিয়ে সব কিছু এখনই ফাইনাল করে ফেলি, কেমন?

স্বপন উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল। কলকাতায় একবারে কোনো নম্বরই পাওয়া যায় না। চার পাঁচবার চেষ্টা করার পর স্বপন ঘোষদাকে পেল। স্বপন বলল,

ঘোষদা একটা বড়ো খবর আছে।

কী?

রঞ্জন মানে রঞ্জন সরকার আমাদের ক্লাবে আসতে চাইছে।

সত্যি!

হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়ে গেছে। আপনি একটু এর সঙ্গে কথা বলুন।

হ্যাঁ — দাও দাও...

স্বপন রঞ্জনের হাতে টেলিফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ঘোষদা কথা বলবেন।

হ্যালো — রঞ্জনের গলাটা একটু কেঁপে উঠল।

রঞ্জন ভাই কেমন আছ! ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাব। আমার স্বপ্ন ছিল তুমি অন্তত একবার আমাদের ক্লাবের জার্সি গায়ে দাও। এত দিনে সে স্বপ্ন সফল হবে। তোমায় আমরা মাথায় করে রাখব।

রঞ্জনের মুখে খেলে গেল ম্লান হাসি। বলল, আমি কিন্তু টাকার জন্যে দল ছাড়ছি না।

জানি জানি — তুমি সেরকম ছেলে নও। তোমার প্রাপ্য সম্মান তুমি আমাদের ক্লাব থেকে পাবেই। তুমি ভাই স্বপনকে একটু ডেকে দাও।

স্বপনদা তোমায় ডাকছেন।

রঞ্জন টেলিফোনটা এগিয়ে দিল। স্বপন সাড়া দিতেই ওদিক থেকে ঘোষদার গলা ভেসে এল। গলায় চাপা উল্লাস।

স্বপন একদম ফাইনাল করে নাও। টাকার জন্যে ভেবো না। যত লাগে লাগুক। রঞ্জনকে টেনে নিতে পারলে ওদের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া যাবে। আর শোনো ব্যাপারটা একদম চেপে রাখবে। রঞ্জনকেও বলবে, সই করার আগে পর্যন্ত কেউ যেন জানতে না পারে।

ঠিক আছে।

স্বপন রিসিভারটা রেখে দিয়ে রঞ্জনের সামনে গিয়ে বসল। বলল, ঘোষদা বলেছেন সই করার আগে পর্যন্ত তোমার দল ছাড়ার কথা কেউ যেন না জানে!

আমিও তাই চাই।

তুমি কবে সই করবে? প্রথম দিনেই...

হ্যাঁ, প্রথম দিনই...

তাই হলো। বাংলার ফুটবল সমাজকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে দলবদলের প্রথম দিনই রঞ্জন সরকার দল ছাড়ল। খেলোয়াড় হিসেবে নাম করার পর থেকে এতদিন যে ক্লাবের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিল রঞ্জন, তার জীবনের সোনালি দিনগুলো কেটেছে যে ক্লাবে, শত প্রলোভনেও যে কোনোদিন দল বদল করার কথা ভাবেনি সেই রঞ্জন সরকার একরাশ অপমান মাথায় নিয়ে সরে এল তার ভালোবাসার ক্লাবটি থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কাগজে লেখালিখি, রঞ্জন সরকারের দল ছাড়ার কারণ হিসেবে নানা গবেষণা। রঞ্জনের পুরোনো ক্লাবের সমর্থকরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন ক্লাব তাঁবুর সামনে। তাঁদের দাবি রঞ্জন সরকারকে ফিরিয়ে আনতে হবে। জবাব দিতে হবে কেন রঞ্জন সরকার দল ছেড়েছে। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কথা শুনতে হলো ক্রীড়া সম্পাদকদের কাছে। কেন এত বড়ো খবরটার কোনো আঁচ তাঁরা পাননি।

রঞ্জন দলবদল করার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়েছিল ক্লাব কর্তাদের। তাঁরা রঞ্জনের বাড়ি ছুটোছুটি শুরু করলেন। জনে জনে ফোন করতে আরম্ভ করলেন। রঞ্জন যে সব খেলোয়াড়দের ছোটো ভাইয়ের মতো দেখে, ভালোবাসে তাদের লাগানো হলো তার মত বদল করানোর জন্যে। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কোথায় রঞ্জন! তার চুলের টিকি পর্যন্ত কেউ দেখতে পেল না। দলবদল করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপন তাকে সরিয়ে দিয়েছে অনেক দূরে। রঞ্জনকে সকলে যখন হন্যে হয়ে খুঁজছে সে তখন সিকিমের পেলিংয়ে পান্ডিম আর কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শৃঙ্গগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে মাউন্ট পান্ডিম হোটেলে, তার ঘরে।

স্বপনরা যা চেয়েছিল তাই হলো। রঞ্জনকে হারানোর মোক্ষম ধাক্কা খেল তার পুরোনো ক্লাব। আর সে যে ফুরিয়ে যায়নি একথাটা প্রমাণ করার জন্যে মরসুমের শুরু থেকেই দুর্দান্ত খেলতে লাগল রঞ্জন। গোলের পর

গোল করতে লাগল।

দেখতে দেখতে এসে গেল রঞ্জনের অগ্নি পরীক্ষার দিন। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে দুই বড়ো দলের প্রথম লড়াই। উত্তেজনায়, উৎসাহে শহর টানটান। দুই প্রধানের লড়াইকে কেন্দ্র করে অনেক বছর পরে কলকাতা আবার মেতে উঠেছে। সল্ট লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে এক লক্ষ কুড়ি হাজার দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা। তবু টিকিটের জন্যে হাহাকার পড়ে গেছে। সকলেরই ধারণা একটা দারুণ কিছু ঘটবে। অনেকদিন পরে সত্যিকারের একটা ভালো খেলা দেখা যাবে।

রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা ভীষণ ব্যস্ত। এই খেলাটিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে তাল দিতে তাঁরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত প্রচার সমস্ত জল্পনা-কল্পনার মধ্যমণি কিন্তু রঞ্জন। অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে—খেলাটা যেন রঞ্জনের সঙ্গে তার পুরোনো দলের লড়াই।

রঞ্জনের মধ্যেও প্রচণ্ড একটা জেদ তাকে টানটান করে তুলেছে। আজ সময় এসেছে সব অপমানের বদলা নেবার। সে যে সত্যিই ফুরিয়ে যায়নি তা প্রমাণ করে দেবার। তার জন্যে সে তৈরি। অপেক্ষা শুধু মাঠে নামার। তবু কোথায় যেন একটু দ্বিধা, একটু আড়ষ্টভাব, চেপে রাখা একটু কষ্ট রঞ্জনকে এক এক সময় বিব্রত করে তুলছে। রঞ্জন নিজেকে বোঝায়, ও তো এ চায়নি। আজকের এই পরিস্থিতি ওর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। না, এসব দুর্বলতা রঞ্জন পাত্তা দেবে না। যে অবহেলা, যে অপমান ওকে করা হয়েছিল তার বদলা তাকে নিতেই হবে। আজই মাঠে প্রমাণ করে দিতে হবে, নান্টুদারা ভুল করেছিল। হ্যাঁ আজই। সময় সে আর পাবে না। যা করার আজই করতে হবে। ঐ এক লক্ষ লোককে সাক্ষী রেখে প্রমাণ করে দিতে হবে— রঞ্জন সরকার সত্যিই ফুরিয়ে যায়নি।

কথাটা মনে হতেই শরীরটা টানটান হয়ে উঠল রঞ্জনের। ও এগিয়ে গেল সল্ট লেকে যাবার জন্যে ক্লাব তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লাক্সারি বাসটার দিকে।

সল্ট লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে লক্ষ লোকের সামনে দুরন্ত গতিতে চলছে দুই প্রধানের খেলা। রঞ্জনকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তার পুরোনো দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা। মাত্র একজনকে সামনে রেখে বাকি দশজনকেই ওরা নীচে নামিয়ে এনেছে। দশ জনের সঙ্গে একা লড়ছে রঞ্জন। রঞ্জনের সহ খেলোয়াড়রা ঠিক ভাবে পাল্লা দিতে পারছে না। ওদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাচ্ছে না রঞ্জন। এইভাবে শেষ হলো প্রথম অর্ধের খেলা।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার চেহারা পুরোপুরি বদলে গেল। যারা এতক্ষণ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছিল তারাই এখন রুখে দাঁড়াল। রক্ষণাত্মক মনোভাব ছেড়ে তারা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাতে সুবিধে অবশ্য রঞ্জনেরই হলো। এতক্ষণ ধরে পায়ে পায়ে খেলোয়াড় ঘুরছিল। এবার তারা খানিকটা সরে গেছে। তবে ওর পেছনে পুলিশম্যান ঠিকই লেগে রইল। তবু আক্রমণে প্রতি-আক্রমণে খেলাটা রীতিমতো জমে উঠল।

কিন্তু গোল কেউ করতে পারছে না। সময় কেটে যাচ্ছে দ্রুত। রঞ্জন ভালো খেলছে ঠিকই কিন্তু ও যেভাবে জ্বলে উঠতে চেয়েছিল তা এখনও পারেনি। অথচ এই সুযোগ সে নষ্ট করতে চায় না। সে জানে দু-দলের সমর্থকদের নজর এখনও ওর ওপরেই আছে। তাই যা করার তা এখনই করতে হবে।

রঞ্জন নীচে নেমে এল। নিজেদের হাফলাইনেরও নীচে। ঠিক সেই সময় ওদের গোলরক্ষক একটা বল পেয়ে

ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। রঞ্জন যেন অপেক্ষাতেই ছিল। বলটা ধরে নিয়েই দুলকি চালে এগিয়ে চলল সে। ওকে বাধা দিতে তিনজন খেলোয়াড় আসছে দেখেই বলটা ঠেলে দিল সমরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজে চলে গেল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। সমর বলটা নিয়ে ক'পা গিয়েই সেই ফাঁকা জায়গার দিকে কোনাকুনি বাড়িয়ে দিয়েই গোলের দিকে এগোতে লাগল। রঞ্জন বলটা ধরে দুজনকে কাটিয়ে পেনাল্টি সীমানার কাছাকাছি এসেই সমরের মাথা লক্ষ্য করে লব করল। সমর হেড দিয়ে বলটা ভাসিয়ে দিল গোলের দিকে। চকিতে রঞ্জন ঘুরে গেল। ওর মুখ তখন নিজেদের গোলের দিকে। ওকে কেউ লক্ষ করেনি। সেই সুযোগটা নিল রঞ্জন। বলটা ওর কাছে ভেসে আসতেই ব্যাক ভলি করল। কেউ কিছু বোঝার আগে বলটা বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঢুকে গেল গোলে।

ব্যাপারটা কী হলো বুঝতে একটু সময় লাগল সমর্থকদের। তারপর সারা মাঠ ফেটে পড়ল উল্লাসে। দলের খেলোয়াড়রা তখন রঞ্জনকে নিতে মেতে উঠেছে। আর ওদিকে যুবভারতীর গ্যালারি বাজি আর পটকার শব্দে গমগম করে উঠল।

একটু পরেই খেলা শেষ হয়ে গেল। সে যে ফুরিয়ে যায়নি এ কথা প্রমাণ করে, সব অপমান অবহেলার বদলা নিয়ে রঞ্জন সরকার ফিরে এল সাজঘরে।

মাথা নিচু করে সাজঘরে ঢুকে এক কোণ একটা চেয়ারে বসে পড়ল। কই সে রকম আনন্দ তো হচ্ছে না তার? সাজঘরে তাকে নিইে হৈ চৈ চলছে। কেউ একজন এসে রে হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কসের একটা বোতল ধরিয়ে দিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে নিল রঞ্জন। মুখ তুলল না। কী রকম যেন একটা কষ্ট, একটা চাপা বেদনা ওকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। এই হৈ চৈ , এই উল্লাস, এই অভিনন্দন ওর ভালো লাগছিল না। সাংবাদিকরা তখন কোচের সঙ্গে কথা বলছেন। ওর সঙ্গেও কথা বলতে চান ওঁরা। ওঁরা কী জিজ্ঞেস করবেন তাও জানা রঞ্জনের। কিন্তু ওঁদের সত্যি কথা তো বলতে পারবে না সে। স্বপনদাকে বলে পাশের ঘরে চলে গেল। দু হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল একটা বেঞ্চিতে।

রঞ্জন অবাক হয়ে অনুভব করল— ওর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। পনেরো বছরের সম্পর্ক ত্যাগ করে আজ সে এ ক্লাবে এলেও সব অপমান, সব অবহেলার বদলা নেবার মুহূর্তে রঞ্জন হেরে গেল। নিজের কাছে। কেঁদে উঠল রঞ্জন। দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে রঞ্জন সরকার। কাঁদছে, শুধু কাঁদছে। কিছুতেই সে নিজেকে সামলাতে পারছে না। পয়লা বৈশাখ বারপুজোয় তাকে না ডাকার অপমানে যে কষ্টটা দলা পাকিয়ে এতদিন ওর কণ্ঠার কাছে আটকে ছিল আজ সেই কষ্ট, সেই জ্বালা চোখের জল হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্ট্রাইকার রঞ্জন সরকারকে।

হাতে কলমে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৫) : পড়াশুনো করেছেন টাকী সরকারি বিদ্যালয়, টাকী সরকারি কলেজ ও সিটি কলেজে। এরিয়ান্স ক্লাবের হয়ে খেলেছেন ক্রিকেট। *দৈনিক বসুমতী* ও *যুগান্তর পত্রিকায়* ক্রীড়া সম্পাদক ও পরে *যুগান্তরের* বার্তা সম্পাদক। প্রথম বই *দেরারি* উপন্যাস। *ক্রিকেট খেলার আইনকানুন, ক্লাবের নাম মোহনবাগান, ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল, মারাদোনা মারাদোনা, ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে, ক্রিকেট মাঠের বাইরে, পাঁচ ক্রিকেটের নক্ষত্র, ফুটবলের পাঁচ নক্ষত্র, রিংয়ের রাজা আলি* প্রভৃতি। তিনি *শুকতারা* ও *নবকল্লোল* পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কর্মরত।

১.১ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বইয়ের নাম লেখো।

১.২ কলকাতার ফুটবল নিয়ে লেখা তাঁর দুটি বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখো :**

২.১ 'এত দুঃখ এত ব্যথা সে কখনও পায়নি।' — এখানে কার দুঃখ-বেদনার কথা বলা হয়েছে?

২.২ 'রঞ্জনদা তুমি কাল ক্লাবে যাওনি?' — এই প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জন কী বলেছিল?

২.৩ গঙ্গার পাড়ে গিয়ে কোন দৃশ্য রঞ্জনের চোখে ভেসে উঠল?

২.৪ 'সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর রঞ্জনের মন অনেকটা শান্ত হলো।' —এখানে রঞ্জনের কোন সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে?

২.৫ 'ঘোষদা একটা বড়ো খবর আছে।'— কী সেই 'বড়ো খবর'?

২.৬ রঞ্জনের দলবদল করার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গো সঙ্গো টনক নড়েছিল ক্লাবকর্তাদের।' — কীভাবে ক্লাবকর্তাদের যে টনক নড়েছে, তা বোঝা গেল?

২.৭ 'ব্যাপারটা কী হলো বুঝতে একটু সময় লাগল সমর্থকদের।' — এখানে কোন ব্যাপারটার কথা বলা হয়েছে?

২.৮ 'দুহাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল একটা বেঞ্চিতে।' — স্ট্রাইকার রঞ্জন সরকারের এমনভাবে শুয়ে পড়ার কারণ কী?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ একটু আগেও সবকটা কাগজে বারপুজোর রিপোর্ট পড়েছে। — এখানে 'ও' বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে? সে সবকটা কাগজে একই বিষয়ের রিপোর্ট পড়ল কেন?

৩.২ ‘ওকে নিয়ে মাতামাতিটা ঠিক আগের মতো আর নেই।’ — আগে ‘ওকে’ নিয়ে কী ধরনের মাতামাতি হতো?

৩.৩ ‘ঠিক এক বছর আগের ঘটনা।’ —একবছর আগে কোন ঘটনা ঘটেছিল?

৩.৪ ‘রঞ্জন সারাটা দিন আর বাড়ি থেকে বোরোয়নি।’ —কোন দিনের কথা বলা হয়েছে?

৩.৫ ‘রঞ্জন নামগুলো পড়ার চেষ্টা করে।’ —রঞ্জন কোন নামগলি পড়ার চেষ্টা করে?

৩.৬ ‘রঞ্জন টেলিফোনটা রেখে দিলো।’ — কোন কথা শুনে রঞ্জন টেলিফোনটা রেখে দিলো?

৩.৭ ‘সত্যি ওরা তোমার সঙ্গে উচিত কাজ করেনি!’ — কোন অনুচিত কাজের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে?

৩.৮ ‘মন স্থির করে ফেলেছ তো?’ —উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোন বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছে?

৩.৯ ‘আপনি সব ব্যবস্থা করুন।’ — কোন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ ‘রাগে ফুঁসছিল রঞ্জন।’ — তার এই রাগের কারণ কী?

৪.২ ‘এত দুঃখ, এত ব্যথা সে কথাও পায়নি।’ — এই দুঃখ-যন্ত্রণার দিনে কীভাবে অতীতের সুন্দর দিনগুলির কথা রঞ্জনের মনে এসেছে?

৪.৩ রঞ্জনের ক্লাবের সঙ্গে তার পনেরো বছরের সম্পর্ক কীভাবে ছিন্ন হলো? এই বিচ্ছেদের জন্য কাকে তোমার দায়ী বলে মনে হয়?

৪.৪ ‘কী করবে ও ঠিক করে ফেলেছে।’ — এখানে কার কথা বলা হয়েছে? সে কী ঠিক করে ফেলেছে? তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে পরবর্তী সময়ে চলতে পারল কি?

৪.৫ ‘তৃতীয় দিন রাত্তিরে টেলিফোন করল অন্য বড়ো ক্লাবের সেক্রেটারিকে।’ — কোন দিন থেকে ‘তৃতীয় দিন’-এর কথা বলা হয়েছে? এই দিন তিনেক সময় তার কীভাবে কেটেছে? টেলিফোনটি করায় কোন পরিস্থিতি তৈরি হলো?

৪.৬ ‘দুই প্রধানের লড়াইকে কেন্দ্র করে অনেক বছর পরে কলকাতা আবার মেতে উঠেছে।’ — গল্প অনুসরণে সেই লড়াইয়ের উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল ম্যাচের বিবরণ দাও।

৪.৭ ‘বলটা বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঢুকে গেল গোলে।’— এরপর সমর্থক আর সহ-খেলোয়াড়দের উল্লাসের বিপ্রতীপে রঞ্জনের বিষণ্ণতার কোন রূপ গল্পে ফুটে উঠেছে?

৪.৮ গল্পের ঘটনা বিশ্লেষণ করে ‘পরাজয়’ গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করো।

শব্দার্থ : অবাঞ্ছিত — অকাম্য/চাওয়া হয়নি এমন। জল্পনা-কল্পনা — অনুমান/আলোচনা। অভিনন্দন — আনন্দের সঙ্গে গৌরবের স্বীকৃতি জানানো।

৫. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

চরকি, সক্কাল, নেমন্তন্ন, নম্বর, ছুটোছুটি

৬. নীচের বাক্যগুলি থেকে সন্ধিবদ্ধপদ খুঁজে নিয়ে সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

৬.১ ওর মনের মধ্যে জমে ওঠা দুঃখ আর অভিমান রূপান্তরিত হয়েছিল রাগে।

৬.২ ক্লাবের কর্তাদের হাবভাব দেখে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

৬.৩ কেউ একটা টেলিফোন পর্যন্ত করল না।

৬.৪ তার পুরস্কার এতদিনে পেলাম স্বপনদা।

৬.৫ ওরা যা দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম।

৭. নিম্নরেখাঙ্কিত অংশের কারক বিভক্তি নির্দেশ করো :

৭.১ <u>রঞ্জন</u> ঘরের মধ্যে চরকির মতো ঘুরছে।

৭.২ <u>গাড়ি</u> পাঠানো তো দূরের কথা।

৭.৩ সারাটা <u>সকাল</u> ও ছটফট করে বেড়িয়েছিল।

৭.৪ কানে ভেসে আসে <u>পাখির</u> ডাক।

৭.৫ রঞ্জন <u>টেলিফোনটা</u> রেখে দিল।

৮. নীচের বাক্যগুলির ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :

৮.১ গুরুত্ব দেয়নি।

৮.২ তুই চলে আয়।

৮.৩ কাল সকালে আমায় কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল।

৮.৪ আমি রঞ্জন সরকার বলছি।

৮.৫ রঞ্জনের মুখে খেলে গেল ম্লান হাসি।

৯. নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :

৯.১ এত দুঃখ, এত ব্যথা সে কখনও পায়নি। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৯.২ সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর রঞ্জনের মন অনেকটা শান্ত হলো। (জটিল বাক্যে)

৯.৩ সেই মুহূর্তে কলিংবেলটা বেজে উঠল। (যৌগিক বাক্যে)

৯.৪ রঞ্জনের গলাটা একটু কেঁপে উঠল। (না-সূচক বাক্যে)

৯.৫ যারা এতক্ষণ দেয়াল পিঠ দিয়ে লড়ছিল তারাই এখন রুখে দাঁড়াল। (সরল বাক্যে)

মাসিপিসি

জয় গোস্বামী

ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায়, জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে

শুকতারাটি ছাদের ধারে, চাঁদ থামে তালগাছে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ছাড়া কাপড় কাচে

দু এক ফোঁটা শিশির তাকায় ঘাসের থেকে ঘাসে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ট্রেন ধরতে আসে

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির মস্ত পরিবার
অনেকগুলো পেট বাড়িতে, একমুঠো রোজগার

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির পোঁটলা পুঁটলি কোথায়?
রেল বাজারের হোমগার্ডরা সাত ঝামেলা জোটায়

সাল মাহিনার হিসেব তো নেই, জষ্টি কি বৈশাখ
মাসিপিসির কোলে-কাঁখে চালের বস্তা থাক

শতবর্ষ এগিয়ে আসে — শতবর্ষ যায়
চাল তোলো গো মাসিপিসি লালগোলা বনগাঁয়

হাতেকলমে

জয় গোস্বামী (১৯৫৪) **:** জন্ম কলকাতায়। বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান কবি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কবিতার বই *প্রত্নজীব, উন্মাদের পাঠক্রম, ভুতুমভগবান, ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা, বজ্রবিদ্যুৎভর্তি খাতা, পাগলী তোমার সঙ্গে* প্রভৃতি। *যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল* তাঁর স্মরণীয় কাব্য-উপন্যাস। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *সেই সব শেয়ালেরা, সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা* প্রভৃতি। সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি *আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার* সহ বহুবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

১.১ জয় গোস্বামীর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

১.২ জয় গোস্বামীর লেখা একটি উপন্যাসের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির অতিসংক্ষেপে উত্তর দাও:**

২.১ 'অনেকগুলো পেট বাড়িতে ... ' 'পেট'-এর আভিধানিক অর্থ কী? এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

২.২ 'সাত ঝামেলা জোটায়' — এখানে 'সাত' শব্দটির ব্যবহারের কারণ কী?

২.৩ 'মাহিনা' শব্দটি কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত? শব্দটির অন্য কোন অর্থ তোমার জানা আছে?

২.৪ কোন শব্দ থেকে এবং কী করে 'জষ্টি' শব্দটি এসেছে?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো:**

৩.১ 'শুকতারাটি ছাদের ধারে, চাঁদ থামে তালগাছে' — এই পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে দিনের কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৩.২ 'দু একটা ফোঁটা শিশির তাকায় ঘাসের থেকে ঘাসে' — এই পঙ্‌ক্তিটিতে যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৩.৩ 'মাস মাহিনার হিসেব তো নেই' — মাস মাহিনার হিসেব নেই কেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ 'শতবর্ষ এগিয়ে আসে — শতবর্ষ যায়' — এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন আলোচনা করো।

৪.২ 'মাসিপিসি' কবিতায় এই মাসিপিসি কারা? তাঁদের জীবনের কোন ছবি এই কবিতায় তুমি খুঁজে পাও?

৪.৩ 'মাসিপিসি' কবিতার এই মাসিপিসিদের মতো আর কাদের কথা তুমি বলতে পারো যাঁদের ট্রেনের উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করতে হয়?

৪.৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি তুমি পড়ে নাও। 'মাসিপিসি' কবিতার সঙ্গে 'ওরা কাজ করে' কবিতার কোন সাদৃশ্য তোমার চোখে পড়ল তা আলোচনা করো।

৫. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৫.১ ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায়, জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে। (জটিল বাক্যে)

৫.২ ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে। (জটিল বাক্যে)

৫.৩ অনেকগুলো পেট বাড়িতে, একমুঠো রোজগার। (যৌগিক বাক্যে)

টিকিটের অ্যালবাম

সুন্দর রামস্বামী

রাজাপ্পা খেয়াল করল, হঠাৎ যেন ওর জনপ্রিয়তা কমে গেছে, গত তিনদিন ধরে সবাই নাগরাজনের চারপাশে ভীড় জমাচ্ছে।

রাজাপ্পা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, নাগরাজন বড্ড দাম্ভিক, কিন্তু কেউ ওর কথায় কান দিল না, কারণ নাগরাজনের কাকা সিঙ্গাপুর থেকে টিকিটের যে অ্যালবামটা পাঠিয়েছিল সেটা সে সবাইকে দেখতে দিত। ছেলেরা নাগরাজনের চারপাশে জড় হয়ে অ্যালবামটা চোখ দিয়ে গিলে খেত, যতক্ষণ না সকালের ক্লাশের জন্য স্কুলের ঘণ্টা বাজত; দুপুরের খাবারের ঘণ্টা পড়লেই আবার সবাই ওর চারপাশে ঘোরাঘুরি করত, আর সন্ধ্যাবেলা ওর বাড়ি ধাওয়া করত। নাগরাজন একটুও অধৈর্য না হয়ে ওদের সবাইকে অ্যালবামটা দেখাত। ও কেবল একটা শর্ত করেছিল — কেউ অ্যালবামটা ধরবে না। ও নিজের কোলে অ্যালবামটা রেখে পাতাগুলো উল্টাতো, আর সবাই প্রাণভরে দেখত।

মেয়েদেরও অ্যালবামটা দেখবার ইচ্ছে হতো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে পার্বতী, নাগরাজনের কাছে এসে মেয়েদের নাম করে চাইত। নাগরাজন মলাট লাগিয়ে অ্যালবামটা তাকে দিত। সব মেয়েদের দেখা হয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলা অ্যালবামটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো।

কেউ রাজাপ্পার অ্যালবামের কথা উল্লেখও করত না, বা তাঁকে পাত্তাও দিত না।

একসময় রাজাপ্পার অ্যালবাম খুব বিখ্যাত ছিল। রাজাপ্পা খুব কষ্ট করে টিকিট জোগাড় করত, যেমন করে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে। এটাই যেন ছিল ওর জীবন। সে ভোর বেলায় অন্যান্য টিকিট সংগ্রাহকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়ত। একটা রাশিয়ার টিকিটের সঙ্গে দুটো পাকিস্তানী টিকিটের বিনিময় করত। বিকেল বেলা স্কুলের সব বই এক কোণে ধুপ করে রেখে, হাফ প্যান্টের পকেটে জলখাবার ঢুকিয়ে, চোঁ চোঁ করে এক কাপ কফি গিলে আবার বেরিয়ে পড়ত। চার মাইল দূরের একটা ছেলের কাছে একটা কানাডার টিকিট আছে...। ওর অ্যালবামটা ছিল ক্লাশের সব চেয়ে বড়ো। রাজস্ব বিভাগের এক অফিসারের ছেলে ওটা পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। কী সাহস! রাজাপ্পা সমুচিত জবাব দিল, ‘তুই কি তোর বাচ্চা ভাইকে আমার কাছে তিরিশ টাকায় বিক্রি করবি?’ ছেলেরা জবাবটার তারিফ করল।

কিন্তু এখন কেউ আর ওর অ্যালবামটার দিকে তাকায়ই না। আরো কি সব বলত। নাগরাজনের অ্যালবামের কাছেপিঠে আসার যোগ্যতাও নাকি ওর অ্যালবামের নেই।

রাজাপ্পা নাগরাজনের অ্যালবামটা তাকিয়ে দেখতেও রাজি নয়। অন্য ছেলেরা যখন ঘিরে ধরে নাগরাজনের অ্যালবামটা দেখত, রাজাপ্পা ওর মুখ ফিরিয়ে নিত, অবশ্য চোরা দৃষ্টিতে অ্যালবামটা দেখত সত্যি, অপরূপ সুন্দর ওটা। হয়ত রাজাপ্পার যে সব টিকিট ছিল সে সব ওটায় ছিল না, হয়ত অত বেশি টিকিটও ছিল না, কিন্তু ওটা ছিল একেবারে অদ্বিতীয়। কোনো স্থানীয় দোকানে অমন অ্যালবাম পাওয়া যায় না।

নাগরাজনের কাকা অ্যালবামের প্রথম পাতায় মোটা মোটা অক্ষরে ভাইপোর নাম লিখে দিয়েছিলেন : এস নাগরাজন। এর নীচে লেখা ছিল :

‘এই অ্যালবামটা চুরি করতে চেষ্টা করছ যে নির্লজ্জ হতভাগা, তাকে বলছি ...’

‘ওপরে আমার নামটা দেখেছ? এটা আমার অ্যালবাম। এটা আমার এবং যতদিন ঘাসের রং সবুজ আর পদ্মফুল লাল, সূর্য পূর্বে উঠবে আর পশ্চিমে অস্ত যাবে একমাত্র আমারই থাকবে।’

ছেলেরা এই লাইন কটা তাদের অ্যালবামে টুকে নিল। মেয়েরাও তাদের বই আর খাতায়।

রাজাপ্পা রেগে গিয়ে বলল, ‘তোরা এমন নকল-নবীশ হয়েছিস কেন রে?’

ছেলেরা ওর দিকে কটকট করে তাকাল, কৃষ্ণান সমুচিত জবাব দিল, ‘কেটে পড় হিংসুটে পোকা!’

‘হিংসুটে! আমি! আমি কেন হিংসুটে হব? আমার অ্যালবামটা অনেক বড়ো নয়? নয়?’

‘তোর ওর মতো টিকিট নেই! ইন্দোনেশীয় সুন্দরীটাকে দ্যাখ ... তুলে ধর, আলোতে দ্যাখ।’

‘আমার যা টিকিট আছে ওর নেই।’

‘‘ফুঃ! একটা দেখা যেটা ওর নেই।’’

‘দশ টাকা বাজি ধর। তোরা আমাকে একটা দেখা যা আমার নেই।’

কৃষ্ণান ঠাট্টা করে বলল, ‘তোর অ্যালবামটা ডাস্টবিনে রাখার যোগ্য।’ সঙ্গের ছেলেরা চেঁচাতে লাগল, ‘বাজে অ্যালবাম। বাজে অ্যালবাম!’

রাজাপ্পা বুঝতে পারল এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

কতদিন ধরে ও এত টিকিট সংগ্রহ করেছে! একটা একটা করে। আর হঠাৎ একদিন পিয়ন নাগরাজনের সিঙ্গাপুরের অ্যালবামটা নিয়ে এল আর অমনি নাগরাজন মহামান্য লোক হয়ে গেল! ছেলেরা দুটোর মধ্যে তফাতও বোঝে না। যতই বোঝানো যাক, কিছুই ফল হবে না।

রাজাপ্পা ভেতরে খাক হয়ে যাচ্ছিল। ক্রমশ ওর স্কুল যেতেও বিতৃষ্ণা জাগতে লাগল। ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশবে কী করে? সাধারণত শনি আর রবিবার ও ছোটাছুটি করে টিকিট সংগ্রহ করত, কিন্তু এ-সপ্তাহে ও বাড়ি থেকে প্রায় নড়লই না। সাধারণত অ্যালবামের পাতা উল্টোয়নি এমন একটা দিনও যেত না। এমন কি রাত্রিবেলা ও লুকিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে অ্যালবাম দেখত। কিন্তু গত দুদিন ওটাকে স্পর্শও করেনি। ওটাকে দেখলেই ওর রাগ হয়। নাগরাজনের অ্যালবামের তুলনায় নিজেরটাকে এখন এক আঁটি ছেঁড়া ন্যাকড়া বলে মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলা রাজাপ্পা নাগরাজনের বাড়ি গেল। ও মনস্থির করে ফেলেছিল। এই অসম্মান ও আর সহ্য করবে না। নাগরাজন হঠাৎ ঘটনাচক্রে একটা টিকিটের অ্যালবাম পেয়েছে, এই তো! টিকিট সংগ্রহে রহস্যের বিষয়ে ও কী জানে? অথবা কী করে অভিজ্ঞতা টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করে তা কী করে জানবে? ও হয়তো মনে করে, আকারে যতো বড়ো হবে, ততো দামি হবে অ্যালবাম। অথবা হয়তো মনে করে, শক্তিশালী দেশের টিকিট দুর্বল দেশের টিকিটের থেকে বেশি দামি। যাই বলো, নাগরাজন অপেশাদার বই তো নয়। রাজাপ্পা সহজেই কম দামি টিকিট দিয়ে দামিগুলো হাতিয়ে নিতে পারবে। ও আগেও অনেককে এমন ঠকিয়েছে। টিকিট সংগ্রহের দুনিয়াতে এমনি চালাকি-প্রতারণা খুব চলে, নাগরাজন তো শিক্ষার্থী মাত্র।

রাজাপ্পা সোজা দোতলায় নাগরাজনের ঘরে গেল। কেউ বাধা দেয়নি কারণ, ও প্রায়ই এবাড়িতে আসত। রাজাপ্পা নাগরাজনের ডেস্কে বসে পড়ল। খানিক বাদে নাগরাজনের ছোটো বোন, কামাক্ষী, এল।

‘দাদা শহরে গেছে, তুমি কি ওর নতুন অ্যালবাম দেখেছ?’

রাজাপ্পা বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না।

‘এটা সত্যি খুব সুন্দর, তাই না? মনে হয়, স্কুলে আর কারো এত সুন্দর অ্যালবাম নেই।’

'কে বলেছে?'

'আমার ভাই।'

'এটা শুধু বড়ো অ্যালবাম, এই পর্যন্ত। শুধু বেঢপ বড়ো হলেই হলো?'

কামাক্ষী কিছু না বলে চলে গেল।

রাজাপ্পা টেবিলের ছড়ানো বইগুলো দেখল। ওর হাত আলতোভাবে টেবিলের ড্রয়ারের তলাটা ছুঁয়ে গেল। অসচেতন ভাবে ও ড্রয়ারটা টানল। তালা লাগানো ছিল। খুললে কেমন হয়? চাবিটা তো বইগুলোর মধ্যেই। রাজাপ্পা সিঁড়ির কাছে গিয়ে চারদিকে দেখে এল। কাউকে দেখা গেল না। ড্রয়ারটা খুলল। নাগরাজনের টিকিটের অ্যালবাম ওপরেই আছে। রাজাপ্পা প্রথম পাতাটা উল্টিয়ে লেখাগুলো পড়ল। ওর বুক টিপটিপ করতে লাগল। ড্রয়ারে তালা লাগিয়ে দিল। অ্যালবামটা হাফ প্যান্টের ভেতরে চালিয়ে দিয়ে সার্টটা নামিয়ে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এক ছুটে বাড়ি।

বাড়িতে পৌঁছে ও অ্যালবামটা বইয়ের র‍্যাকের পেছনে লুকিয়ে রাখল। শরীর দিয়ে তখন হল্কা বেরুচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, মাথায় রক্তের চাপ বোধ হচ্ছে।

রাত আটটার সময় আপ্পু, যে ওর বাড়ির উল্টো দিকে থাকে, এসে রাজাপ্পাকে বলল যে, নাগরাজনের অ্যালবামটা চুরি গেছে। ও আর নাগরাজন শহরে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে অ্যালবামটা চুরি গেছে।

রাজাপ্পা একটা কথাও বলল না, ও মনে মনে প্রার্থনা করল, আপ্পু যেন চলে যায়। আপ্পু চলে গেলে, ও দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল আটকে দিল। তারপর শেলফের পেছন থেকে অ্যালবামটা বের করে আনল। হাত যেন জমে গেল। কী হবে যদি কেউ জানালা দিয়ে দেখে থাকে? ও ফের অ্যালবামটা শেলফের পেছনে রেখে দিল।

রাজাপ্পা রাত্রিরে খাবার প্রায় ছুঁলই না। ওর বাবা মা চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, শরীর ভালো আছে কিনা। হয়ত ঘুমিয়ে পড়লে শান্তি আসবে। রাজাপ্পা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম কিন্তু এল না। কী হবে যদি ও ঘুমিয়ে থাকার সময় কেউ অ্যালবামটা দেখে ফেলে? ও উঠে অ্যালবামটা বের করে বালিশের তলায় রেখে দিল।

রাজাপ্পা ঘুম থেকে ওঠার আগেই আপ্পু সকালে এসে হাজির। আপ্পু কিছুক্ষণ আগেই নাগরাজনের বাড়ি গিয়েছিল।

'আমি শুনলাম, তুই কাল ওর বাড়ি গিয়েছিলি?'

রাজাপ্পার মনে হল ওর বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ-ও হয়, না-ও হয় এভাবে মাথা নাড়ল।

'কামাক্ষী বলল, আমি আর নাগরাজন যখন শহরে গিয়েছিলাম, তখন তুই-ই একমাত্র ওদের বাড়িতে গিয়েছিলি?'

রাজাপ্পা আপ্পুর কথার সুরে সন্দেহ আঁচ করতে পারল।

'নাগরাজন সারা রাত ধরে কেঁদেছে। ওর বাবা পুলিশকে খবর দিতে পারে।'

রাজাপ্পা কোনো কথা বলল না।

নাগরাজনের বাবা পুলিশ সুপারের অফিসে কাজ করতেন। ওর ইঙ্গিত মাত্রে পুলিশবাহিনী অ্যালবাম খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে।

রাজাপ্পার ভাগ্য ভালো, যে আপ্পুর ভাই তাকে ডাকতে এল। ও চলে যাবার অনেকক্ষণ পর অব্দি রাজাপ্পা নিজের বিছানায় নিথর হয়ে বসে থাকল। বাবা সকালের খাবার খেয়ে সাইকেল করে অফিসে চলে গেলেন।

সামনের দরজায় টোকা দেবার আওয়াজ। তবে কি পুলিশ?

রাজাপ্পা বালিশের তলা থেকে অ্যালবামটা আঁকড়ে ধরে, এক ছুটে ওপরে গিয়ে বইয়ের তাকের পেছনে ওটা রেখে দেয়। কী হবে যদি পুলিশ খোঁজাখুজি করে? তাক থেকে ওটা বের করে শার্টের নীচে ঢুকিয়ে নীচে নেমে এল।

কেউ দরজায় টোকা দিয়েই যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে মা চেঁচিয়ে বললেন, 'দরজাটা খুলছিল না কেন?' খানিকক্ষণ পরে উনি নিজেই দরজা খুলে দেবেন ঠিক করলেন।

রাজাপ্পা ছুটে বাড়ির পেছনে চানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। চানের জল গরম করার জন্য একটা বড়ো উনুন ছিল। রাজাপ্পা উনুনের মধ্যে অ্যালবামটা ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য সব টিকিট পুড়ে গেল — এমন সব টিকিট যা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। রাজাপ্পার চোখ জলে ভরে গেল।

মা চেঁচাচ্ছিলেন, 'তাড়াতাড়ি আয়, নাগরাজন তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

রাজাপ্পা হাফ প্যান্টটা খুলে ভেজা তোয়ালে জড়িয়ে, চানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওপরে গেল। নাগরাজন একটা চেয়ারে বসেছিল।

ভাঙা গলায় নাগরাজন বলল, 'আমার টিকিটের অ্যালবাম হারিয়ে গেছে।' ওর মুখে দুঃখের ছাপ, আর দু চোখ ফুলে লাল।

রাজাপ্পা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় রেখেছিলি?'

'আমি নিশ্চিত, আমি ওটাকে টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিলাম। ড্রয়ারটাতে চাবিও লাগিয়েছিলাম। আমি খানিকক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি ওটা হাওয়া হয়ে গেছে।'

ওর গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। নিজেকে এত দোষী মনে হচ্ছিল যে রাজাপ্পা বন্ধুর দিকে তাকাতে পারছিল না, নাগরাজনকে বলল, ''কাঁদিস না।''

কিন্তু যতই নাগরাজনকে সে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল, ততই সে কাঁদতে লাগল।

রাজাপ্পা ছুটে নীচে গেল, তারপর মুহূর্তে নিজের অ্যালবামটা হাতে করে নিয়ে এল।

'নাগরাজন, এই আমার অ্যালবাম। এটা তোর। আমার দিকে এভাবে তাকাস না। আমি সত্যি তোকে এটা দিচ্ছি। অ্যালবামটা তোর।'

'তুই ঠাট্টা করছিস ...'

'না। আমি এটা তোকে দিচ্ছি। সত্যি, আজ থেকে এটা তোর। এটা ধর।'

নাগরাজন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। রাজাপ্পা তার অ্যালবাম দিয়ে দিচ্ছে! রাজাপ্পা ওকে নেবার জন্য অনুরোধ করে যাচ্ছে!

নাগরাজন জিজ্ঞেস করল, ‘তোর কী হবে?’

‘আমি আর এটা চাই না।’

‘একটা টিকিটও না?’

‘না, একটাও না।’

‘কিন্তু তুই তোর টিকিট ছাড়া কী করে বাঁচবি?’

রাজাপ্পার চোখ জলে ছলছল করে উঠল।

‘কাঁদিস না। তোকে অ্যালবাম দিতে হবে না। রেখে দে। কত কষ্ট করে এটা বানিয়েছিস।’

‘না। তুই রাখ। এটা তোর জন্য। বাড়ি নিয়ে যা। দয়া করে নে, নিয়ে চলে যা।’ কাঁদতে কাঁদতে রাজাপ্পা বলল।

নাগরাজন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অ্যালবামটা নিয়ে নীচে নেমে এল। রাজাপ্পা জামার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ওর সঙ্গে সঙ্গে এল।

ওরা দরজায় এসে দাঁড়াল। নাগরাজন বলল, ‘ধন্যবাদ। চলি রে।’

নাগরাজন রাস্তায় নেমে এসেছে, এমন সময় রাজাপ্পা ওকে ডাকল। নাগরাজন ফিরে এল।

‘তুই যদি দয়া করে অ্যালবামটা শুধু আজ রাত্রিরের জন্য দিস, কাল সকালেই তোকে ফিরিয়ে দেবো।’

নাগরাজন রাজি হয়ে ফিরে গেল।

রাজাপ্পা সিঁড়ি বেয়ে ওর ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দিল। অ্যালবামটা শক্ত করে জাপটে ধরে, হু হু করে কাঁদতে লাগল।

হাতে কলমে

সুন্দর রামস্বামী (১৯৩১—২০০৫) **:** তামিল সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক। *কালাচুবাড়ু* পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। *ওরু পুলিয়া মারাথিন কথাই* (একটি তেঁতুলগাছের গল্প) এবং *কুঝানথৈকন, পেনকল, আনকল* (শিশু, নারী, পুরুষ) উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তিনি *পদুবিয়া* ছদ্মনামে লিখতেন। ২০০৪ সালে *কথাচূড়ামণি* পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। গল্পটি বাংলায় তরজমা করেছেন অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত।

১.১ সুন্দর রামস্বামী কোন ভাষার লেখক?

১.২ তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১. ‘টিকিটের অ্যালবাম’ গল্পের লেখক কে?

২.২. মূল গল্পটি কোন ভাষায় রচিত?

২.৩. গল্পটিতে মোট কটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়?

২.৪. মেয়েদের পক্ষ থেকে কে নাগরাজনের থেকে অ্যালবামটি চেয়ে নিয়ে যেত?

২.৫. রাজাপ্পা কীভাবে তার অমূল্য ডাকটিকিটগুলি সংগ্রহ করত?

২.৬. নাগরাজনের অ্যালবামটি তাকে কে উপহার দিয়েছিলেন?

২.৭ সেই অ্যালবামের প্রথম পাতায় কী লেখা ছিল?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ নাগরাজনের অ্যালবামের প্রতি সকলে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল কেন?

৩.২ ‘কেটে পড় হিংসুটে পোকা!’ — বক্তা কে? কাকে সে এমন কথা বলেছে? তুমি কি এই কথার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাও?

৩.৩ ‘এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।’ — উপলব্ধিটি কার? কী বিষয়ে তর্কের প্রসঙ্গ এসেছে? তর্ক করে লাভ নেই কেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ ‘হঠাৎ যেন ওর জনপ্রিয়তা কমে গেছে’ — কার এমন মনে হয়েছে? এই ‘জনপ্রিয়তা’ হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণ কী?

৪.২ ‘কেউ রাজাপ্পার অ্যালবামের কথা উল্লেখও করত না, বা, তাকে পাত্তাও দিত না।’ — সকলের এমন আচরণের কারণ গল্প অনুসরণে আলোচনা করো।

৪.৩ স্কুলের ছেলেমেয়েদের নাগরাজন কীভাবে তার নিজের অ্যালবামটি দেখতে দিত?

৪.৪ ডাকটিকিট সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে রাজাপ্পার তীব্র আকর্ষণের যে পরিচয় গল্পে রয়েছে তা আলোচনা করো।

৪.৫ ‘চোরাদৃষ্টিতে অ্যালবামটা দেখত’ — সেই চোরাদৃষ্টিতে দেখা অ্যালবামটির কোন বিশেষত্বের কথা গল্পে রয়েছে?

৪.৬ নাগরাজনের প্রতি রাজাপ্পা কীভাবে ক্রমশ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল?

৪.৭ ‘সন্ধ্যাবেলা রাজাপ্পা নাগরাজনের বাড়ি গেল।’ — কোন উদ্দেশ্য নিয়ে রাজাপ্পা নাগরাজনের বাড়িতে গিয়েছিল? এর মধ্যে দিয়ে তার চরিত্রের কোন দিকটি ধরা পড়ে?

৪.৮ ‘রাজাপ্পার চোখ জলে ভরে গেল।’ — কোন পরিস্থিতিতে রাজাপ্পার চোখ জলে ভরে উঠল?

৪.৯ ‘নাগরাজন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।’ — তার হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কারণ কী?

৪.১০ ‘কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েই ‘টিকিটের অ্যালবাম’ গল্পে রাজাপ্পার আত্মশুদ্ধি ঘটেছে।’ — গল্পের ঘটনা বিশ্লেষণ করে উদ্ধৃতিটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো।

৫. নীচে তোমাদের জন্য কয়েকটি ভারতীয় ডাকটিকিটের ছবি দেওয়া রইল। তোমরা এমনই অনেক ভারতের কিংবা অন্যান্য দেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম তৈরি করো।

লোকটা জানলই না

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বাঁ দিকের বুক-পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়-হায়
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল।
অথচ
আর একটু নীচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ
তার হৃদয়

লোকটা জানলই না।

তার কড়িগাছে কড়ি হলো
লক্ষ্মী এলেন
রণ-পায়ে।
দেয়াল দিল পাহারা
ছোটোলোক হাওয়া
যেন ঢুকতে না পারে।
তারপর
একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন —

লোকটা জানলই না।।

হাতে কলমে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—২০০৩) : বাংলা কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য নাম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *অগ্নিকোণ, চিরকুট, ফুল ফুটুক, যত দূরেই যাই, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে, জল সইতে,* প্রভৃতি। তাঁর গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত *কাঁচা-পাকা, ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন* প্রভৃতি গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে।

১.১ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা দুটি গদ্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ ‘বাঁদিকে বুক পকেটটা সামলাতে সামলাতে ...’ — এখানে ‘বাঁদিকের বুক পকেট’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২.২ ‘ইহকাল পরকাল’ — এই শব্দদ্বয় এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

২.৩ কবিতায় লোকটির দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে কী খসে পড়ল?

২.৪ ‘আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ’ আসলে কী? তাকে এরকম বলার কারণ বুঝিয়ে দাও?

শব্দার্থ : কড়ি — শামুক জাতীয় প্রাণীর খোল বিশেষ। এক সময়ে আমাদের দেশে বিনিময় মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হতো। রণপা — বাঁশ ও কাঠের তৈরি কৃত্রিম লম্বা পা।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো :**

৩.১ ‘লোকটা জানলই না’ পঙ্‌ক্তিটি দুবার কবিতায় আছে। একই পঙ্‌ক্তিটি একাধিকবার ব্যবহারের কারণ কী?

৩.২ কবি ‘হায়-হায়’ কোন প্রসঙ্গে বলেছেন? কেন বলেছেন?

৩.৩ কবিতাটির নামকরণ যদি হতো ‘হৃদয়’ বা ‘আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ’ তাহলে তা কতটা সার্থক হতো?

৩.৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার যে ধরন তোমার চোখে পড়েছে তা নিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

৪. ‘অথচ’ শব্দটিকে ব্যাকরণের ভাষায় কী বলি? কবিতায় এই ‘অথচ’- শব্দটির প্রয়োগ কবি কেন করেছেন ?

৫. ‘আলাদিনের আশ্চর্য -প্রদীপ’ পঙ্‌ক্তিটিতে মোট ক’টি দল? রুদ্ধদল এবং মুক্তদলের সংখ্যাই বা কত?

৬. কবিতার মধ্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা ক’টি ও কী কী?

বই পড়ার কায়দা কানুন ৪

লাইব্রেরি এল কেমন করে ?

ক্লাসে না এলেও প্রিয় বন্ধু ক্লাসের পড়ানোর বিষয় তোমার জন্য লিখে রাখলে তুমি তা সহজেই পেয়ে যাও, ফলে পড়া তৈরি করা সহজ হয়। তেমনি আমাদের আগের যুগের মানুষরাও যা জেনেছে, যা শিখেছে বা জীবনে চলতে গিয়ে যে সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, লিখতে শেখা মাত্রই সেই জ্ঞান লিখে রেখে গেছে পরের যুগের মানুষের জন্যে, যাতে পরের যুগের মানুষেরা বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করে নিজেদের জীবনকে সহজ করে চালাতে পারে। যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে তার সময়ের কথা পরের পরের যুগের মানুষকে জানানোর একটা চেষ্টা থাকে।

আজকের দিনে কাজটা খুব সহজ মনে হলেও অনেক আগে তা কিন্তু অত সহজ ছিল না। কারণ অনেককাল মানুষ লিখতে জানত না, সে সময়ের কথা তারা মনে রাখতো আর মুখে মুখে সে কথা জানিয়ে যেত পরের কালের মানুষদের। লিখতে শেখার পর আজ থেকে প্রায় ৫৬০০ বছর আগে সুমেরিয়রা কাদা মাটির চাকতি করে তার ওপরে ছুঁচলো নলখাগড়ার কলম দিয়ে লিখে সেগুলো পুড়িয়ে পরপর সাজিয়ে রাখতো। এর পরে পাথরের বা পশুর চামড়ার ওপরেও লেখার চেষ্টা হয়েছে। মাটি বা পাথরের ফলক খুব ভারী বলে ব্যবহারের অসুবিধা হতো।

প্রায় ৫৫০০ বছর আগে মিশরের মানুষেরা নীল নদের ধারে প্যাপিরাস নামে আট-দশ ফুট লম্বা গাছের ছাল একটার পরে একটা জুড়ে রোদে শুকিয়ে লেখার উপযোগী করে তার ওপরে লেখা শুরু করল। এগুলো গুটিয়ে রাখা হতো। প্যাপিরাস শব্দটা থেকেই পরবর্তীকালে ইংরাজিতে 'পেপার' অর্থাৎ কাগজ শব্দটা এসেছে। প্যাপিরাসের মতো আমাদের দেশে ভুজগাছের ছাল এবং তালগাছের পাতাও লেখার কাজে ব্যবহৃত হতো। তালপাতা বা ভুজগাছের ছাল একটা নির্দিষ্ট মাপে কেটে লেখার উপযোগী করে হাতে লেখার পর কাঠের পাটাতনের মধ্যে পরপর থাক দিয়ে সাজিয়ে কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা হতো। এভাবেই তৈরি হতো তালপাতার পুথি বা ভূর্জপত্রের পুথি। ছাপানো বইয়ের আগে এভাবেই এক সময়ের মানুষেরা তাদের জানা বিদ্যা, নানা অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি খুব কষ্ট করে প্রথমে মাটির ফলকে, তারপরে পাথরে, ক্রমে প্যাপিরাস, ভেলামেন, পার্চমেন্ট, তালপাতা বা ভূর্জপত্র ইত্যাদিতে লিখে গিয়েছিল বলেই না তাদের কথা আমরা পরের সময়ের মানুষেরা জানতে পেরেছি। তবে সমাজের অল্প কিছু জ্ঞানীগুণী মানুষদের কাছে থাকতো এই সব পুথি এবং তাঁরাই সেগুলো জানতেন, সমাজের সবাই তা জানতে পারতো না।

কাগজ তৈরি ও মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানুষ যখন বই ছাপানোর কৌশল শিখল তখন থেকেই এক যুগের মানুষের স্মৃতি, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ফসল বইয়ের মাধ্যমে অনেক মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে যেতে

পারল। প্রথমে রাজারাজড়া বা ধনী লোকেদের অধিকারে এই সব বইয়ের সংগ্রহ থাকলেও ক্রমে মানুষ যাতে সহজে জানতে, শিখতে বা আনন্দ পেতে পারে সে জন্য সমাজের দরকারেই লাইব্রেরি গড়ে উঠল। প্রায় ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে বই-ই মানুষের জানার, শেখার বা পড়ে আনন্দ পাওয়ার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠল। লাইব্রেরিতে ধরে রাখা তথ্য জানতে পারার ফলেই পরের যুগের মানুষ সহজেই আগের যুগের মানুষের নানা কাজের ভুল বা সমস্যাগুলোর সমাধান করে ক্রমশ উন্নতি করতে পেরেছে। তাই একথা বললে ভুল হবে না আজকের সভ্যতার উন্নতিতে লাইব্রেরির খুব বড় ভূমিকা আছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'লাইব্রেরি' শব্দটার অর্থও বদলে গেছে। আজকের দিনে লাইব্রেরি বলতে শুধু বইয়ের সংগ্রহ বোঝায় না। লাইব্রেরিতে এখন বই ছাড়াও সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি থাকে। এগুলোকে বলে ডিজিটাল মাধ্যম। 'লাইব্রেরি' শব্দের উৎপত্তি লাতিন ভাষায় 'liber' ('লাইবার' বা 'লিবার') শব্দ থেকে। এই শব্দের মানে গাছের ছালের ভেতরের দিক, যে দিকে লেখা হতো। লেখা ছালগুলোকে পাতা ধরে পরপর গুছিয়ে রাখা হতো বলে তাদের সংগ্রহকে বলা হতো 'লাইব্রেরি'। এখন অবশ্য কোনো লাইব্রেরিতেই তেমন সংগ্রহ পাওয়া যাবে না। কম্পিউটার আর ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে লাইব্রেরির ধারণা আরো বদলে গেছে। এখন যে কোনো তথ্য অনেক সময়েই আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বইয়ের চেয়ে অনেক সহজে, অনেক তাড়াতাড়ি পেতে পারি, অথচ আমরা জানতে পারিনা যে সেই তথ্যটা ঠিক কোন জায়গায় বা কোন লাইব্রেরেতে রাখা আছে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে থাকা তথ্য বা বিভিন্ন মানুষের দেওয়া তথ্য একাধিক কম্পিউটারের সংযোগের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে আসে। বাড়িতে বসেই লাইব্রেরি ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যায়। তাই আজকের দিনে এ ধরনের লাইব্রেরিকে বলে 'দেওয়ালবিহীন লাইব্রেরি' (Library without walls)।

'লাইব্রেরি' নামের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : মানুষের মধ্যে 'সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে' ... 'লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্রপথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। ... যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না'।

বিভিন্ন যুগে লাইব্রেরির সংগ্রহের প্রকৃতি বা চরিত্র বদলায় কিন্তু লাইব্রেরির উদ্দেশ্য একই থাকে। প্রাচীন যুগের প্যাপিরাস বা তালপাতার পুঁথি বা পরের কালের বই বা আজকের দিনে ডিজিটাল মাধ্যম যাই আসুক না কেন মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা যুগে যুগে প্রবাহিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে লাইব্রেরির হাত ধরে। তাই লাইব্রেরিকে বলা হয় 'মানব সমাজের সামগ্রিক স্মৃতির সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ'।

---

১) নিজের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বা অন্য কোনো লাইব্রেরিতে গিয়ে ক্যাটালগ বা সূচি দেখে বই খোঁজার কৌশল শিখে নাও।

২) পঞ্চম শ্রেণি থেকে যে বই পড়ার ডায়েরি লিখেছে তার থেকে বিষয় ধরে ও লেখক ধরে বইয়ের বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরি করো।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারো।

বই পড়ার ডায়েরি

বইয়ের নাম	বই পড়ার তারিখ	বিষয় বা ধরন	কীভাবে পেলে	তোমার মতামত

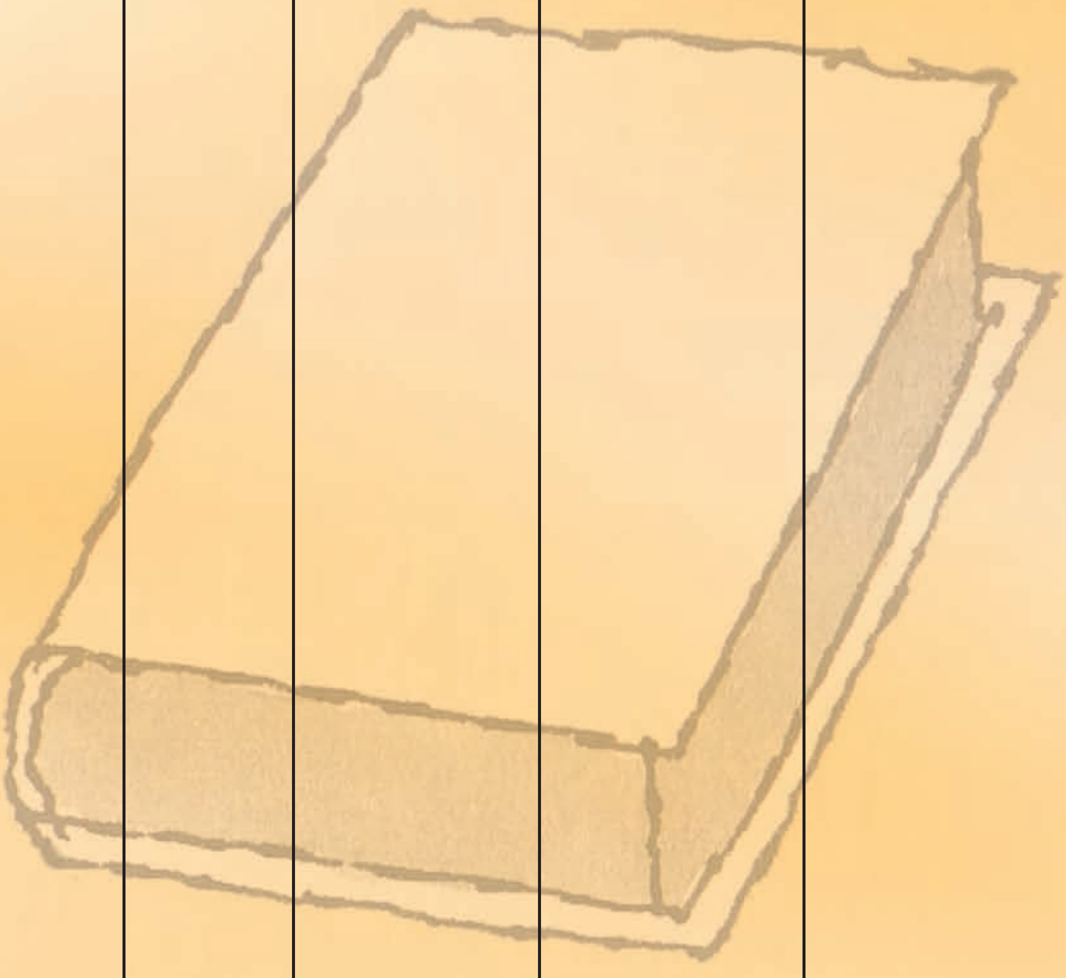

বই পড়ার ডায়েরি

বইয়ের নাম	বই পড়ার তারিখ	বিষয় বা ধরন	কীভাবে পেলে	তোমার মতামত

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা -২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন -২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তকটি (অষ্টম শ্রেণির বাংলা) রূপায়িত হলো। বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিশিখনের পূর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা সযত্নে পুরো বইটি পড়ে নেবেন।
- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) 'বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি'। ছাত্রছাত্রীরা এই বইয়ের বিভিন্ন পাঠে পড়বে বন্ধুত্ব ও সমানুভূতির বিভিন্ন দিক। একই সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইয়েও আছে স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গান, গল্প, এবং কবিতা।
- এই বইটির 'হাতে কলমে' অংশটিতে CCE পুস্তিকার বিভিন্ন দিকনির্দেশগুলি অনুসৃত হয়েছে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বিভিন্ন সূচক যেমন এই সমস্ত 'হাতে কলমে' অংশে ব্যবহার করা যাবে তেমনই পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যেরও প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মুক্ত চিন্তা চর্চার পরিসর (Open Ended Learning Task), বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্যগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ জুড়ে চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকদের মূল্যায়ন বিষয়ে যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর করতেই এই প্রয়াস।
- শিশুশিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি। এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর কবি, লেখক লেখিকাদের নামের বানানের ক্ষেত্রে মূল রূপটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

* 'ছোটোদের পথের পাঁচালী' বইটি গোটা বছর ধরে পড়াতে হবে। বইটির শেষ অংশে 'হাতে-কলমে' অংশে কিছু নমুনা প্রশ্ন থাকল। এর সাহায্য নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা নতুন-নতুন প্রশ্ন ও অন্যান্য কৃত্যালি উদ্ভাবন করবেন এবং এইভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারাটি বজায় রাখবেন।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার পাঠক্রম ও সম্ভাব্য সময়সূচি :

মাসের নাম		পাঠের নাম
জানুয়ারি	প্রথম পর্যায়	বোঝাপড়া, অদ্ভুত আতিথেয়তা, প্রাণ ভরিয়ে (গান), চন্দ্রগুপ্ত
ফেব্রুয়ারি		বনভোজনের ব্যাপার (নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ), সবুজ জামা, চিঠি (আলাপ)
মার্চ		পরবাসী, পথচলতি, একটি চড়ুই পাখি
এপ্রিল	দ্বিতীয় পর্যায়	দাঁড়াও, পল্লীসমাজ, ছন্নছাড়া, গাঁয়ের বধূ (গান)
মে		গাছের কথা, হাওয়ার গান
জুন ও জুলাই		কী করে বুঝব, রূপসী বাংলা, আষাঢ়ের কোন (গান), ঘরোয়া (স্বাদেশিকতা), সোজন বাদিয়ার ঘাট
আগস্ট	তৃতীয় পর্যায়	জেলখানার চিঠি, স্বাধীনতা, আদাব, ভয় কি মরণে (গান)
সেপ্টেম্বর		হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভালোবাসা কি বৃথা যায়?), ঘুরে দাঁড়াও, সুভা
অক্টোবর ও নভেম্বর		পরাজয়, মাসিপিসি, টিকিটের অ্যালবাম, লোকটা জানলই না